দ্বিতীয় অধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্যায়ের ছোটগল্পে নারীভাবনার রূপ
(হিতবাদী - সাধনা - ভারতী পর্ব -- ১২৮৪-১৩১৮)

দীর্ঘ সময় ধরে বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকাকে অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্যায়ের ছোটগল্পগুলি প্রকাশিত হয়েছে। প্রাক্ সবুজপত্র পর্বের এই অধ্যায়টিকে 'হিতবাদী - সাধনা - ভারতী পর্ব' রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। উক্ত তিনটি পত্রিকা ছাড়াও আরো কয়েকটি পত্রিকায় প্রথম পর্যায়ের অর্থাৎ ১২৮৪ থেকে ১৩১৮ সন পর্যন্ত লেখা গল্পগুলি প্রকাশিত হলেও এ অধ্যায়টিকে হিতবাদী - সাধনা -ভারতী পর্ব রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। কারণ এই পর্বের গল্পগুলি মূলতঃ এই তিনটি পত্রিকাকে আশ্রয় করেই অধিকাংশ ছোটগল্প প্রকাশিত হয়েছিল। উক্ত তিনটি পত্রিকা ছাড়াও 'নবজীবন', 'বালক', 'প্রদীপ', 'বঙ্গদর্শন', 'প্রবাসী' প্রভৃতি পত্রিকাতেও দু-একটি করে গল্প প্রকাশ পেয়েছে। সূচনা পর্বে (১২৯১) 'ঘাটের কথা' রচনার প্রায় সাত বছর পরে ১২৯৮ বঙ্গাব্দের জ্যৈষ্ঠমাসে প্রকাশিত সাপ্তাহিক হিতবাদী পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প রচনার দ্বিতীয় যুগের সূত্রপাত। হিতবাদী পত্রিকার আদর্শ ছিল 'হিতের মনোহারী চ দুর্লভং বচঃ।' কিন্তু ছোটগল্পকে হিতকর ও মনোহারী করে তোলার নির্দেশ রবীন্দ্রনাথ মেনে নিতে পারেন নি। ফলে ছ' সপ্তাহে ছ'টি গল্প প্রকাশ হবার পর রবীন্দ্রনাথ হিতবাদী পত্রিকার পরিচালকমণ্ডলী ও অরসিক পাঠক সমাজের বিরূপ প্রতিক্রিয়ায় গল্পলেখা বন্ধ করে দেন। বস্তুতপক্ষে 'সাধনা ভারতী' পর্বে রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পের এক স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায় রচিত হয়েছে। সাধনা পত্রিকার চারবছর আয়ুসীমার মধ্যে প্রথম তিনবছর সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শেষ বছরে স্বয়ং

রবীন্দ্রনাথ সম্পাদক হন। এই চারবছরে বিচিত্র ভাব বিচিত্র বিষয় নিয়ে রবীন্দ্রনাথের ছত্রিশটি গল্প প্রকাশিত হয়। এরপর ১৩০৫ বঙ্গাব্দের ভারতী পত্রিকায় বৈশাখ থেকে পৌষ মাসের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের সাতটি ছোটগল্প প্রকাশিত হয়। ঐ বছরে রবীন্দ্রনাথ ভারতী পত্রিকার সম্পাদক। এরপর আটটি গল্প অর্থাৎ মোট পনেরোটি গল্প ভারতীতে প্রকাশিত হয়। ছোটগল্পের সংখ্যা ও উৎকর্ষের কথা বিচার করে হিতবাদী পর্বের পরবর্তী ১৮৯১ থেকে ১৯০০ সাল পর্যন্ত দশবছরকে সাধনা-ভারতী পর্ব বলা যায়। 'নবজীবন', 'বালক', 'সখা ও সাথী', 'বঙ্গভাষা' এবং 'প্রবাসী' — পত্রিকায় এই সময়ে রচিত একটি করে গল্প প্রকাশ পায়। আবার 'বঙ্গদর্শন' ও 'প্রদীপ' পত্রিকায় দুটি করে গল্প প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ ১২৮৪ থেকে ১৩১৮ পর্যন্ত এ পর্যায়ে আমরা মোট একাত্তরটি গল্প পাই। পত্রিকার প্রকাশকাল অনুযায়ী গল্পগুলি হল —

১।	ভিখারিণী	(ভারতী, শ্রাবণ -ভাদ্র ১২৮৪)
২।	ঘাটের কথা	(ভারতী, কার্তিক ১২৯১)
৩।	রাজপথের কথা	(নবজীবন, অগ্রহায়ণ ১২৯১)
৪।	মুকুট	(বালক, বৈশাখ - জ্যৈষ্ঠ ১২৯২)
৫।	দেনাপাওনা	(হিতবাদী, ১২৯৮)
৬।	পোস্টমাস্টার	(হিতবাদী, ১২৯৮)
৭।	গিন্নী	(হিতবাদী, ১২৯৮)
৮।	রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা	(হিতবাদী, ১২৯৮)
৯।	ব্যবধান	(হিতবাদী, ১২৯৮)
১০।	তারাপ্রসন্নের কীর্তি	(হিতবাদী, ১২৯৮)
১১।	খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন	(সাধনা, অগ্রহায়ণ ১২৯৮)
১২।	সম্পত্তি সমর্পণ	(সাধনা, পৌষ ১২৯৮)
১৩।	দালিয়া	(সাধনা, মাঘ ১২৯৮)
১৪।	কঙ্কাল	(সাধনা, ফাল্গুন ১২৯৮)
১৫।	মুক্তির উপায়	(সাধনা, চৈত্র ১২৯৮)
১৬।	ত্যাগ	(সাধনা, বৈশাখ ১২৯৯)
১৭।	একরাত্রি	(সাধনা, জ্যৈষ্ঠ ১২৯৯)

১৮। একটা আষাঢ়ে গল্প (সাধনা , আষাঢ় ১২৯৯)
১৯। জীবিত ও মৃত (সাধনা , শ্রাবণ ১২৯৯)
২০। স্বর্ণমৃগ (সাধনা , ভাদ্র - আশ্বিন ১২৯৯)
২১। রীতিমত নভেল (সাধনা , ভাদ্র - আশ্বিন ১২৯৯)
২২। জয় পরাজয় (সাধনা , কার্তিক ১২৯৯)
২৩। কাবুলিওয়ালা (সাধনা , অগ্রহায়ণ ১২৯৯)
২৪। ছুটি (সাধনা , পৌষ ১২৯৯)
২৫। সুভা (সাধনা , মাঘ ১২৯৯)
২৬। মহামায়া (সাধনা , ফাল্গুন ১২৯৯)
২৭। দান প্রতিদান (সাধনা , চৈত্র ১২৯৯)
২৮। সম্পাদক (সাধনা , বৈশাখ ১৩০০)
২৯। মধ্যবর্তিনী (সাধনা , জ্যৈষ্ঠ ১৩০০)
৩০। অসম্ভব কথা (সাধনা , আষাঢ় ১৩০০)
৩১। শাস্তি (সাধনা , শ্রাবণ ১৩০০)
৩২। একটি ক্ষুদ্র পুরাতন গল্প (সাধনা , ভাদ্র ১৩০০)
৩৩। সমাপ্তি (সাধনা , আশ্বিন - কার্তিক ১৩০০)
৩৪। সমস্যাপূরণ (সাধনা , অগ্রহায়ণ ১৩০০)
৩৫। খাতা (১৩০০ , ছোটগল্প গ্রন্থে অর্ন্তভুক্ত)
৩৬। অনধিকার প্রবেশ (সাধনা , শ্রাবণ ১৩০১)
৩৭। মেঘ ও রৌদ্র (সাধনা , আশ্বিন - কার্তিক ১৩০১)
৩৮। প্রায়শ্চিত্ত (সাধনা , অগ্রহায়ণ ১৩০১)
৩৯। বিচারক (সাধনা , পৌষ ১৩০১)
৪০। নিশীথে (সাধনা , মাঘ ১৩০১)
৪১। আপদ (সাধনা , ফাল্গুন ১৩০১)
৪২। দিদি (সাধনা , চৈত্র ১৩০১)
৪৩। মানভঞ্জন (সাধনা , বৈশাখ ১৩০২)
৪৪। ঠাকুরদা (সাধনা , জৈষ্ঠ ১৩০২)
৪৫। প্রতিহিংসা (সাধনা , আষাঢ় ১৩০২)
৪৬। ক্ষুধিত পাষাণ (সাধনা , শ্রাবণ ১৩০২)
৪৭। অতিথি (সাধনা , ভাদ্র - কার্তিক ১৩০১)

৪৮। ইচ্ছাপূরণ (সখা ও সাথী , আশ্বিন ১৩০২)
৪৯। দুরাশা (ভারতী , বৈশাখ ১৩০৫)
৫০। পুত্রযজ্ঞ (ভারতী , জ্যৈষ্ঠ ১৩০৫)
৫১। ডিটেকটিভ্ (ভারতী , আষাঢ় ১৩০৫)
৫২। অধ্যাপক (ভারতী , ভাদ্র ১৩০৫)
৫৩। রাজটিকা (ভারতী , আশ্বিন ১৩০৫)
৫৪। মণিহারা (ভারতী , অগ্রহায়ণ ১৩০৫)
৫৫। দৃষ্টিদান (ভারতী , পৌষ ১৩০৫)
৫৬। সদর ও অন্দর (প্রদীপ , আষাঢ় ১৩০৭)
৫৭। উদ্ধার (ভারতী , শ্রাবণ ১৩০৭)
৫৮। দুর্বুদ্ধি (ভারতী , ভাদ্র ১৩০৭)
৫৯। ফেল (ভারতী , আশ্বিন ১৩০৭)
৬০। শুভদৃষ্টি (প্রদীপ , আশ্বিন ১৩০৭)
৬১। যজ্ঞেশ্বরের যজ্ঞ (পত্রিকায় অপ্রকাশিত)
৬২। উলুখড়ের বিপদ (পত্রিকায় অপ্রকাশিত)
৬৩। প্রতিবেশিনী (পত্রিকায় অপ্রকাশিত)
৬৪। নষ্টনীড় (ভারতী , বৈশাখ-অগ্রহায়ণ ১৩০৮)
৬৫। দর্পহরণ (বঙ্গদর্শন , ফাল্গুন ১৩০৯)
৬৬। মাল্যদান (বঙ্গদর্শন , চৈত্র ১৩০৯)
৬৭। কর্মফল (পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি , স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে মুদ্রিত ১৩১০)
৬৮। মাস্টারমশায় (প্রবাসী , আষাঢ় , শ্রাবণ ১৩১৪)
৬৯। গুপ্তধন (বঙ্গভাষা , কার্তিক ১৩১৪)
৭০। রাসমণির ছেলে (ভারতী , আশ্বিন ১৩১৮)
৭১। পণরক্ষা (ভারতী , পৌষ ১৩১৮)

এই একাত্তরটি গল্পের মধ্যে যেসব গল্পে নারী জীবনের বিচিত্র সমস্যার কথা ও নারীর নিজস্ব জীবনভাবনা ফুটে উঠেছে সে সমস্ত গল্পই আমাদের আলোচনায় স্থান পাবে ।

ভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের প্রথম গল্প 'ভিখারিণী' (১২৮৪) যে ছোটগল্প হিসাবে সার্থকতা পায় এ কথা ছোটগল্প আলোচক - সমালোচক প্রত্যেকেই অভিমত প্রকাশ করেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ প্রথম গল্পটিতে একটি নারীচরিত্রকে কেন্দ্র করে তার জীবনকথার সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যক্ত করেছেন, আর নামকরণেই স্পষ্ট হয়েছে যে এখানে এক দরিদ্র নারীর পরিচয় উঠে এসেছে। একসময়ে যে রমণীটি স্বামীর উপস্থিতিতে সংসারে সম্পদে-ঐশ্বর্যে-সুখে জীবন অতিবাহিত করেছে, অথচ স্বামীর মৃত্যুর পর প্রতিকূল সমাজ পরিবেশ তার জীবনে কী করুণ পরিণতি এনে দিয়েছে এ গল্পে তা দেখানো হয়েছে। এ গল্পে বিধবা রমণীটির একমাত্র কন্যা কমল। শৈশবে কমলের সঙ্গে তার প্রতিবেশী রাজপুত যুবক অমরসিংহের বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাদের পিতামাতা উভয়ের বিবাহ দেওয়ার সংকল্প করে। কিন্তু বিবাহের কয়েকদিন পূর্বে কাশ্মীররাজ্যের সীমায় যুদ্ধ বাঁধলে পিতার সঙ্গে অমরসিংহ যুদ্ধে যায়। এই যুদ্ধে পিতা অজিতসিংহের মৃত্যু হয় এবং অমরসিংহ কারারুদ্ধ হয়। ফলে অসহায় দরিদ্র বিধবা মাতা ও বালিকা কন্যা কমলের জীবনে দুর্যোগের কালো ছায়া নেমে আসে।

অনাহার-ক্লিষ্ট মায়ের কথা ভেবে কমল একাকিনী পথে ভিক্ষা করতে নামে ও পথে দস্যুর হাতে পড়ে। দস্যুরা কমলকে বন্দী করে তার মার কাছে পাঁচশত মুদ্রা দাবী করে। নিরুপায় হয়ে কন্যার প্রাণ রক্ষার্থে মাতা ধনী ও অসৎচরিত্র মোহনলালের শরণাপন্ন হয়। মোহনলাল এতগুলি টাকা দিতে অরাজী হলে সন্তানের প্রাণ রক্ষার্থে মোহনলালের সঙ্গে কন্যার বিবাহ প্রস্তাবকেই মেনে নেয় মাতা। কমলের সঙ্গে দুর্বৃত্ত প্রকৃতির মোহনলালের বিবাহে কমলের জীবনে পুনর্বার অত্যাচার ও অপমানের অন্ধকার নেমে আসে। অমরের অনুরাগী হওয়ায় কমলের প্রতি বিরক্ত হয়ে মোহনলাল তাকে পিতৃগৃহে পাঠিয়ে দেয়। অবশেষে দীর্ঘকাল পর অমরসিংহ ফিরে

আসে। হতভাগিনী কমল এই ভেবে তার মনকে সান্ত্বনা দেয় -- ''আমি দরিদ্র, আমার কিছুই নাই, আমার কেহই নাই, আমি বুদ্ধিহীনা ক্ষুদ্র বালিকা, তাঁহার চরণরেণুরও যোগ্য নহি, তবে তাহাকে ভাই বলিব কোন অধিকারে! তাঁহাকে ভালোবাসিব কোন অধিকারে! আমি দরিদ্র কমল, আমি কে যে তাঁহার স্নেহ প্রার্থনা করিব!' এভাবে মানসিক যন্ত্রণা ও ক্লেশে কমল গুরুতর পীড়ায় আক্রান্ত হয়। কঠিন পীড়ায় সে যখন মূর্চ্ছিতপ্রায় তখন সেখানে চিকিৎসকের বেশে অমরসিংহ অবতীর্ণ হয়। অমরসিংহকে মৃত্যুকালে কাছে পেয়ে প্রশান্ত হাসিতে প্রেমে আনন্দে শেষবারের মত হৃদয় ভরে নিয়ে কমলের অকালে মৃত্যু হয়। শোকবিহ্বলা বিধবা মাতা এরপর ভিখারিণী হয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়ায়। যদিও এই গল্পটি যথার্থ ছোটগল্পের শিল্পগুণ সম্পন্ন হয়ে ওঠেনি তা রবীন্দ্রনাথের নিজের মন্তব্যে প্রকাশিত -- ''ষোলবছর বয়সের মুখে দেখা দিয়েছে 'ভারতী', ... তার মধ্যে আমি লিখে বসলুম এক গল্প। সেটা যে কী বকুনির বিনুনি নিজে তার যাচাই করবার বয়স ছিলনা, বুঝে দেখবার চোখ যেন অন্যদেরও তেমন করে খোলেনি।''(পৃঃ ৭৩৪, ছেলেবেলা, রবীন্দ্র রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, সুলভ সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ, পৌষ ১৪০২)। ছোটগল্পের শিল্পরূপ না পেলেও স্বামীহারা এক নারী তার কিশোরী কন্যাকে নিয়ে সমাজের লোলুপ দৃষ্টির পুরুষের কাছে কীভাবে পরাভূত হয় এবং মানসিকভাবে চরম বিধ্বস্ত হয়ে পথের ভিখারিণীতে পরিণত হয় তারই সকরুণ চিত্র ফুটে উঠেছে। ছোটগল্পের নির্দিষ্ট শিল্পরূপের মতো ঘটনা ও অহেতুক কথার বোঝা কমিয়ে আরম্ভ ও সমাপ্তির শাণিত বক্তব্যে যদি চরিত্রটির জীবনকথা ফোটানো যেত তাহলে চরিত্রটি অন্য মাত্রা পেত। তবে এখানে নারীর প্রসঙ্গ কথার জন্যই আমাদের আলোচনায় গল্পটিকে নেওয়া হয়েছে।

'ভিখারিণী' প্রকাশের সাতবছর পর রবীন্দ্রনাথের 'ঘাটের কথা' ও 'রাজপথের কথা' গল্পদুটি যথাক্রমে 'ভারতী' ও 'নবজীবন' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ছোটগল্পের বেশকিছু লক্ষণ এই গল্পদুটিতে প্রকাশ পেয়েছে। এই দুটি গল্পেই বিরহিণী নারীর গভীর বেদনার

কথা ব্যক্ত হয়েছে। ঘাট ও রাস্তা -- এই দুই জড় স্থানের স্বগতোক্তিতে নারীর হতাশা, বঞ্চনা ও ব্যর্থতার বেদনাই পরোক্ষভাবে যেন গল্পে উঠে এসেছে। ডঃ সুকুমার সেন এ প্রসঙ্গে বলেছেন -- ''সদ্য প্রিয়জন বিরহী কবি এই দুই কাহিনীর মধ্য দিয়া মনে হয় নিজেরই অর্ন্তগূঢ় বেদনার প্রতিধ্বনি তুলিয়াছেন। গল্প দুইটি রবীন্দ্রনাথের জীবন ভাবনার দুই প্রধান সিম্বল বহন করিতেছে। ঘাট অচল, পথ সচল -- দুই-ই বহমান জনজীবনস্রোতের সাক্ষী।'' (পৃঃ ২৬২, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ৪র্থ খণ্ড, পঞ্চম সংস্করণ)

'ঘাটের কথা' (১২৯১) গল্পে ঘাট বর্তমান প্রজন্মকে তার জরাজীর্ণ রূপ নিয়ে প্রপিতামহীদের কাহিনী শোনাচ্ছে। এই প্রজন্মের দুই-তিন পুরুষ পূর্বের এক ছোট্ট মেয়ে কুসুম। বাড়ীর কাছে গঙ্গার ঘাটে কুসুমের নিয়মিত আসা যাওয়া চলত। এমনকি তার ঘাটে যাওয়ার নির্দিষ্ট সময়ক্ষণটিও গল্পে ফুটে উঠেছে -- ''ঘাটের বাম বাহুর বাইরের দিকে যেখানে দুটি ইঁটের অভাবে গর্ত হয়েছিল সেই গর্তের মধ্যে একটি ফিঙে পাখি বাসা বেঁধেছিল। ভোরবেলায় যখন সেই পাখিটি জেগে উঠে 'মৎস্য পুচ্ছের ন্যায় তাহার জোড়াপুচ্ছ দুই চারিবার দ্রুত নাচাইয়া শিস দিয়া আকাশে উড়িয়া যাইত' তখনই কুসুম আসত।''

ঘাটের অন্যান্য সমস্ত মেয়েদের কাছে অত্যন্ত প্রিয় ছিল এই 'কুসি', 'খুসি', 'রাক্কুসী', 'কুসুমী' এই নানা নামধারী কিশোরী মেয়েটি। মেয়েটির প্রকৃত নাম কুসুম। কুসুম যেমন এই গঙ্গার ঘাট ভালোবাসত, তেমনি গঙ্গার ঘাটও কুসুমের এই আনন্দময় আগমন-বার্তায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠত। এই পাষাণ ঘাটেরও যেন প্রাণ দিয়ে কুসুমের ছোট্ট ছায়াটিকে ধরে রাখবার সাধ জাগত মনে। এমনই এক মাধুর্যময় কোমল বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিল কুসুম। কিন্তু সমাজের নিয়ম রক্ষার্থে সাত আট বছর বয়সেই এই প্রাণোচ্ছল সংস্পর্শ

থেকে বিচ্ছিন্ন করে কুসুমকে বিয়ে দেয় তার বাড়ীর লোকেরা। কুসুমের স্বামী বিদেশে চাকরী করত। বিবাহের পর যে স্বামীকে কুসুম প্রায় দেখেনি, বোঝেনি, চেনেনি -- শুধুমাত্র পত্রযোগে সেই স্বামীর মৃত্যুসংবাদ নিয়ে সে পিতৃগৃহে ফিরে আসে। ইতিমধ্যে কুসুমের অন্যান্য সঙ্গীদের সবারই বাল্যবিবাহ অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে বা হবে। বালবিধবার করুণ ম্লান মূর্তিতে নিঃসঙ্গ একাকী কুসুম বিবাহের এক বছর পর এক সন্ধ্যায় তার চিরপরিচিত ঘাটের কাছে মাথা নীচু করে চুপ করে এসে বসে। নদীর ঢেউগুলি যেন তাদের পূর্ব পরিচিত প্রিয় কুসুমকে হাত তুলে বিভিন্ন নামে ডাকতে থাকে। এভাবে দীর্ঘ দশ বছর কেটে যায়। কুসুম এখন কিশোরী থেকে যুবতীর সৌন্দর্য্যে ভরে ওঠে। একদিন এসময় গঙ্গার ঘাটে আবির্ভূত হয় গৌরতনু নবীন এক সন্ন্যাসী। ঘাটের মেয়েরা দলে দলে এই সন্ন্যাসীর কাছে ভীড় করে। তাদের কথাতেই প্রকাশ পায় সন্ন্যাসীর সঙ্গে কুসুমের স্বামীর হুবহু সাদৃশ্যের কথা -- "ওলো এযে আমাদের কুসুমের স্বামী।" অবশেষে এই প্রসঙ্গ মেয়েদের আত্মসচেতনতার অভাবে, ঔদাসীন্যে সে সময়ই চাপা পড়ে যায়। কুসুমের সঙ্গেও ক্রমে সন্ন্যাসীর পরিচয় ঘটে। সন্ন্যাসীর কাছে শাস্ত্র ব্যাখ্যা শুনে, পূজার্চ্চনার কাজে কুসুম নিজেকে নিযুক্ত রাখে। এভাবে কুসুম ব্যক্তিগত দুঃখ-যন্ত্রণা ও যৌবনের বিরহ বেদনাকে লাঘব করতে চায়। কিন্তু ভক্তিভাব আলোচনায় কুসুম নিজেকে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ রাখতে পারেনা, তার চিরবুভুক্ষু সুপ্ত নারীত্ব সন্ন্যাসীর সংস্পর্শে নূতন করে জেগে ওঠে। এই চিত্ত অস্থিরতার কারণে কুসুম ঘাটে আসা বন্ধ করলে সন্ন্যাসী-ই তাকে ডেকে পাঠায়। সন্ন্যাসীর কাছে কুসুম জানায় তার দেবসেবায় অবহেলার কারণ, তার চিত্তচাঞ্চল্য। সন্ন্যাসীর প্রশ্নের উত্তরে কুসুম জানায় তার স্বপ্নপুরুষ স্বয়ং সন্ন্যাসী। এরপর সন্ন্যাসীর কাছে কুসুম শোনে কঠোর হৃদয় বিদারক নির্মম সেই বাণী -- "আমাকে তোমার ভুলিতে হইবে। বলো, এই সাধনা করিবে।" সদ্য বিকশিত কুসুম অনুভব করে এই সন্ন্যাসীকে ভোলা তার পক্ষে সম্ভব নয়, আবার সন্ন্যাসীর আদেশ উপেক্ষা করবার মতো শক্তিও তার নেই। ফলে 'হৃদয়ের স্বামীর' কথা মানতে গিয়ে মৃত্যুকেই শেষপর্যন্ত মেনে নিল কুসুম। তার আশৈশব কালের চিরসঙ্গী ঘাটের কোলেই সে আত্মহত্যা করল। লক্ষণীয় কুসুম কোন কথা বলেনি,

ঘাট-ই বর্ণনা করেছে কুসুমের নারী জীবনের যন্ত্রণা , মর্মকথাকে । কুসুমের ব্যক্তিগত বেদনা বড় না হয়ে ঘাটের কথাই গল্পে বড় হয়ে উঠেছে ।

উনিশ শতকীয় সমাজের গভীর অস্তিত্বসংকটকে এ গল্পে রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরলেন গল্পের কাহিনীর মধ্যে দিয়ে । সামাজিক অনুশাসন , পুরুষ শাসিত সমাজের ইচ্ছা-অনিচ্ছার কাছে পরাভূত এক নারীচিত্তের কথা এগল্পে এভাবে ব্যক্ত হল । যেখানে বালবিধবা এক নারী শরীর ও মনে সম্পূর্ণরূপে প্রস্ফুটিত হয়েও স্বামী ছাড়া অন্য পুরুষকে স্বপ্নে ও কল্পনায় আকাঙ্ক্ষা করবার স্বাধীনতাটুকুও পায় না । এমনই এক নীরব , অস্ফুটপ্রায় মর্মবেদনা কীভাবে আত্মহননের পথ বেছে নেয় সে কথাই 'ঘাটের কথা' গল্পে প্রকাশিত হয়েছে ।

'নবজীবন' পত্রিকায় প্রকাশিত 'রাজপথের কথা' (১২৯১) গল্পে 'ঘাটের কথা' গল্পের মতো সুস্পষ্ট কাহিনী পাই না । তবে এতেও একটি বালিকা মেয়ের প্রেম , প্রেমে প্রতীক্ষা ও ব্যর্থতার হাহাকার ধ্বনির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে । সুদূর অতীত থেকে আজ পর্যন্ত রাজপথের বুকে বহু মানুষ চলে এসেছে । তার মধ্য থেকে এক বালিকার হৃদয়ভঙ্গের করুণ বিষণ্ন জীবন বেদনার কথা রাজপথের কাছে স্মরণীয় । কোন এক পথিকের পদধ্বনি ও সংগীত শ্রবণে মুগ্ধ এই বালিকাটি বহুদূর থেকে অপরাহ্ন বেলার নির্দিষ্ট সময়ে প্রত্যহ তার রিনিঝিনি নুপূর বাজিয়ে রাজপথের ধারে বাঁধানো বটগাছের পাশে শ্রান্তদেহে এসে দাঁড়াত । প্রিয় পথিকের পথচলার আনন্দ এই বালিকাটির মনেও আশা-আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলত । রাজপথ এই বালিকাটির আপাতঃ সুখের সাক্ষী হয়ে ওঠে । কিন্তু ফাল্গুন মাসের উদাস বসন্ত ঋতুতে কোন কারণে এই পথিকের পথচলার ছন্দ বন্ধ হয়ে যায় । সেদিন থেকে মেয়েটির স্বপ্ন-আশা-কল্পনার চির অবসান ঘটে । মেয়েটির এই গভীর হৃদয় বেদনার কথা সহানুভূতির সঙ্গে রাজপথ বর্ণনা

করেছে -- " কিছু দূরে গিয়া আর সে চলিতে পারিল না । আমার উপরে , ধূলির উপরে লুটাইয়া পড়িল । দুই বাহুতে মুখ ঢাকিয়া বুক ফাটিয়া কাঁদিতে লাগিল । কে গা মা ! আজি এই বিজন রাত্রে আমার বক্ষেও কি কেহ আশ্রয় লইতে আসে । তুই যাহার কাছ হইতে ফিরিয়া আসিলি সে কি আমার চাইতেও কঠিন । তুই যাহাকে ডাকিয়া সাড়া পাইলি না সে কি আমার চেয়েও মূক । তুই যাহার মুখের পানে চাহিলি সে কি আমার চেয়েও অন্ধ ।

বালিকা উঠিল , দাঁড়াইল , চোখ মুছিল -- পথ ছাড়িয়া পার্শ্ববর্তী বনের মধ্যে চলিয়া গেল । হয়তো সে গৃহে ফিরিয়া গেল , হয়তো এখনো সে প্রতিদিন শান্তমুখে গৃহের কাজ করে -- হয়তো কাহাকেও কোন দুঃখের কথা বলে না ; কেবল এক-একদিন সন্ধ্যাবেলায় গৃহের অঙ্গনে চাঁদের আলোতে পা ছড়াইয়া বসিয়া থাকে , কেহ ডাকিলেই আবার তখনই চমকিয়া উঠিয়া ঘরে চলিয়া যায় । কিন্তু তাহার পরদিন হইতে আজ পর্যন্ত আমি আর তাহার চরণস্পর্শ অনুভব করি নাই ।"

লক্ষণীয় অনেক পদশব্দের কথা রাজপথের মনে থাকে না , কেবল সেই বালিকার করুণ নুপুর ধ্বনি-ই তার মাঝে মাঝে মনে পড়েছে । এভাবে এখানে নারীর কথা ব্যক্ত । এখানে 'রাজপথ' কুসুমের ঘাটের মতো আবেগার্ত হয়ে ওঠেনি , তাই এই মেয়েটির শোক যেন কালসাগরে লোপ পেয়ে যায় , পাঠকের মনে প্রবল জিজ্ঞাসা সঞ্চার করে না ।

'ঘাটের কথা' ও'রাজপথের কথা' প্রকাশের সাত বছর পরে সাপ্তাহিক হিতবাদী পত্রিকাতে ১২৯৮ সালে পরপর ছয় সপ্তাহে ছয়টি গল্প বের হয় ,- 'দেনাপাওনা' , 'পোস্টমাস্টার' , 'গিন্নী' , 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা' , 'ব্যবধান' ও 'তারাপ্রসন্নের কীর্তি' । উল্লেখণীয় যে , ১৮৯১ সালের মে মাসে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় 'হিতবাদী' পত্রিকা প্রকাশিত হয় । এই পত্রিকায় প্রকাশিত ছয়টি গল্পের মধ্যে 'দেনাপাওনা' , 'পোস্টমাস্টার' , 'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা' ও 'তারাপ্রসন্নের কীর্তি' গল্প চারটিতে সংসার পরিবারের সীমায় নারীর সাধারণ স্বাভাবিক জীবন পরিচয় ফুটে উঠেছে ।

'দেনাপাওনা' (১২৯৮) গল্পে পণপ্রথা ও কৌলিন্য প্রথার কদর্য দিকটি প্রদর্শিত হলেও এ গল্পের নায়িকা নিরুপমা পণপ্রথা সম্পর্কে যে বলিষ্ঠ , সুস্পষ্ট যুক্তিযুক্ত নিজস্ব মতামত পোষণ করেছে তার মধ্য দিয়ে সে সময়ের নারীর একধরনের নীরব প্রতিবাদের পরিচয় পাওয়া যায় ।

মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজের মানুষ রামসুন্দর মিত্রের কাছে পাঁচ পুত্র সন্তানের পর নিরুপমার জন্ম ছিল অত্যন্ত আনন্দের । নিজ সামর্থের কথা না ভেবেই পিতা আদরের কন্যাটিকে আজীবন সুখী করবার স্বপ্নে এক বনেদী পরিবারের উচ্চশিক্ষিত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট পাত্রের সঙ্গে বিবাহ স্থির করেন । এই বিয়েতে পাত্রপক্ষের দাবী দশহাজার টাকা ও বহুল দানসামগ্রী । দরিদ্র পিতা এর সিংহভাগই সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হন । অথচ লগ্নভ্রষ্টা হবার সামাজিক ভয়ে পিতা করুণ মিনতি করে প্রতিশ্রুতি দেন বিয়ের দিন যে , বিয়ের পরেই বাকী টাকা দিয়ে দেবেন । আপাতঃ অর্থে এই সুখের বিবাহ নিরুপমার জীবনে অভিশাপ বয়ে আনে । তার শিক্ষিত স্বামী তাকে যথোচিত মানবিক মর্যাদা দিলেও বিয়ের পরেই স্বামী চাকরীসূত্রে বাইরে চলে যায় । ফলে শ্বশুরবাড়ীতে পণের টাকা পুরোপুরি না

দিতে পারার অপরাধে নিরুপমার প্রতি নেমে আসে অকথ্য অপমান ও অত্যাচারের নির্মম পালা। পিতৃগৃহের নিরন্তর নিন্দা শুনে শুনে রুদ্ধদ্বারে বসে অশ্রু বিসর্জনের মধ্য দিয়ে তার দিন কাটতে থাকে। পণের টাকার কারণে নিরুপমাকে সামান্য মানবিক স্বীকৃতিটুকু দিতে নারাজ ছিল তার শাশুড়ী। শ্বশুরবাড়ীর দাসী - চাকরেরা পর্যন্ত নিরুপমা ও তার পিতাকে নীচু নজরে দেখত। শ্বশুরবাড়ীতে কন্যার চরম অপমান ও অনাদরের কারণে পিতা এই পণের টাকা দিতে সর্বভাবে উদ্যোগী হন। নিরুপায় পিতা কোন পথ খুঁজে না পেয়ে শেষপর্যন্ত বসতবাটি বিক্রি করে টাকা যোগাড়ের চেষ্টা করেন। পিতার এই উদ্যোগে জেগে ওঠে নিরুপমার আত্মমর্যাদা ও নারী-ব্যক্তিত্ব। বলিষ্ঠ ভাষায় সে বলে ওঠে -- "বাবা, তুমি যদি আর এক পয়সা আমার শ্বশুরকে দাও, তাহলে আর তোমার মেয়েকে দেখতে পাবে না, এই আমি তোমার গা ছুঁয়ে বললুম, ...টাকা যদি দাও তবেই অপমান। তোমার মেয়ের কি কোন মর্যাদা নেই। না বাবা, এ টাকা দিয়ে তুমি আমাকে অপমান করো না।" বস্তুতঃ পিতার বসতবাটি বিক্রি করা টাকা দিয়ে বরপণের টাকা মিটিয়ে নিরুপমা নিজসুখ কিনতে চাইল না ঠিকই, কিন্তু টাকা ফিরিয়ে দেবার দুঃসাহসে সেদিন থেকেই তার কাছে শ্বশুরবাড়ী কন্টকশয্যায় পরিণত হল। একমাত্র পিতার কাছেই নিরুপমা এই প্রতিবাদী ভাবনার প্রকাশ ঘটিয়ে ছিল। কিন্তু সমাজের অন্যান্য মানুষের মনে এই প্রতিবাদী ভাবনা কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি। তাই গল্পের পরিণতিতে নিরুপমার প্রতিবাদের কোন উত্তর ধ্বনিত হয়ে ওঠেনি।

আসলে এগল্পে নিরুপমার মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ দেখালেন উনিশ শতকের নারীর মধ্যেও ভিতরে ভিতরে অন্তর্দহন শুরু হয়েছে। তাই নিরুপমা আর পাঁচটা সাধারণ মেয়ের মতো নিজেকে টাকার মূল্যে বিলিয়ে দিতে পারেনি। নিরুপমা যে মনবিহীন, মস্তিষ্কবিহীন শুষ্ক নারী শরীর নয়, তাই তিলে তিলে মৃত্যু বরণ করার মধ্য দিয়ে সে তার নীরব প্রতিবাদকেই প্রকাশ করেছে। তার এই প্রতিবাদ তৎকালীন সমাজের মানুষের কাছে উচ্চকিত ও গ্রহণযোগ্য

না হলেও পণপ্রথার বিরুদ্ধাচরণ করে সে যুগে নিরুপমা যে প্রশ্ন তুলেছে -- এদিক থেকেই তার সচেতন নারী সত্ত্বার পরিচয় গল্পে প্রকাশিত হয়েছে।

'পোস্টমাস্টার' (১২৯৮) গল্পে রতন বারো-তেরো বছরের 'পিতৃ-মাতৃহীন অনাথা বালিকা'। কলকাতা শহরের পোস্টমাস্টার চাকরীসূত্রে অতি অখ্যাত উলাপুর গ্রামে আসে। এখানেই রতনের সঙ্গে তার পরিচয় হয়। দুঃস্থ রতন পোস্টমাস্টারকে তার প্রয়োজনীয় কাজকর্ম করে দেয়, বিনিময়ে সে খেতে পায়। আত্মীয় পরিজনহীন প্রবাসী পোস্টমাস্টারের মন উদাস করা সন্ধ্যায় রতন-ই তার কাছে হয়ে ওঠে গৃহের স্বজনের মতো। বিশেষতঃ পোস্টমাস্টার রতনের সঙ্গে আন্তরিক আচরণ করে, তার অতীত জীবন কথা জানতে চায়, তাকে লেখাপড়া শেখায়। পল্লীপ্রকৃতির নির্জন মায়াময় পরিবেশে দাদাবাবুর সঙ্গে নিভৃত আলাপচারিতায় ও সহানুভূতির সংস্পর্শে অনাথা নিঃসঙ্গ রতনের মনে ধীরে ধীরে সুপ্ত নারীত্ব জাগতে থাকে। এভাবে রতন দাদাবাবুকে তার আপনার লোক বলে বিশ্বাস করে। দাদাবাবুর মা দিদিদের কথা শুনে রতন তাদের মূর্তি কল্পনার চোখে দেখতে পায়। পল্লী পরিবেশের মশা ইত্যাদির উপদ্রবে কিছুদিনের মধ্যে দাদাবাবু অসুস্থ হয়ে পড়ে। সেই সময়ে বালিকা রতন 'জননীর পদ' অধিকার করে বসে। যথোচিত কর্তব্য পালনের দ্বারা দাদাবাবুকে সে সুস্থ করে তোলে। কিন্তু সুস্থ হয়েই দাদাবাবু এই গন্ডগ্রাম থেকে বদলী হয়ে চলে যায়। অনাথা, একাকিনী রতন দাদাবাবুর সঙ্গে যাবার আশায় ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কিন্তু শহুরে, শিক্ষিত দাদাবাবুর মন রতনের জন্য বিচলিত হলেও 'পৃথিবীতে কে কাহার' তত্ত্বেই সন্তুষ্ট হয়ে ওঠে। সরল অসহায় বালিকা রতনের মনে কিন্তু কোন দার্শনিক তত্ত্ব জাগে না। ক্ষীণ মিথ্যা আশায় তার জীবন কাটে।

'রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা' (১২৯৮) গল্পে রামকানাইয়ের সততা , মহত্ত্ব ও ব্যক্তিগৌরবই মুখ্য বিষয় । তার পাশে ঐ পরিবারের গৃহবধূদের স্বার্থলোভী সংকীর্ণ বিষয়াসক্তিপূর্ণ জীবনচিত্র রূপায়িত হয়েছে । রামকানাইয়ের বৌদি বরদাসুন্দরী স্বামী গুরুচরণের মৃত্যুকালে যেভাবে ডাঁটাচচ্চড়ি সহ ভাত খেয়েছে , তাতে তার নারীসুলভ কমনীয়তার অভাব দেখি । আবার রামকানাইয়ের স্ত্রী তথা নবদ্বীপের মা ভাশুরের সম্পত্তির ভাগ থেকে বঞ্চিত হয়ে ছেলেকে অসৎ উপায়ে উইল জাল করিয়েছে । যার পরিণতিতে রামকানাইয়ের মৃত্যু হয়েছে । গল্পটিতে এরকমই সংসারের আবিলতাযুক্ত সংকীর্ণ মনোভঙ্গির নারীচরিত্র অঙ্কিত হয়েছে । প্রকৃত অর্থে নারীব্যক্তিত্বের কোন নতুন দিক লক্ষ করা যায় না ।

'তারাপ্রসন্নের কীর্তি' (১২৯৮) গল্পে দাক্ষায়ণী লেখক স্বামী তারাপ্রসন্নের গৃহিণী । তাদের চার-চারটি কন্যা সন্তান রয়েছে । তারাপ্রসন্ন ঘরকুনো স্বভাবের লাজুক প্রকৃতির মানুষ । ঘরে বসে আপন মনে সাহিত্যচর্চা করে । স্ত্রী দাক্ষায়ণী অল্পবিস্তর রামায়ণ মহাভারত পড়েছে । স্বামীর লেখা সাহিত্য তার বোধগম্য হয় না । কিন্তু স্বামীর এই সৃষ্টিকে দাক্ষায়ণীর অসাধারণ মনে হয় । এদিকে ঘরে মেয়েরা বড়ো হচ্ছে । তাদের ভবিষ্যৎ ভেবে আর্থিক উন্নতির জন্য স্বামী-স্ত্রী চিন্তিত । অবশেষে দাক্ষায়ণী স্বামীকে তার লেখা কলকাতায় ছেপে বই প্রকাশ করতে পরামর্শ দেয় । স্ত্রীর সমস্ত সঞ্চিত অর্থ , গহনা দিয়ে লেখক তারাপ্রসন্ন 'বেদান্ত গ্রন্থ' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করে । গ্রন্থটি সাহিত্যগুণ বর্জিত হওয়ায় পাঠকমহলে কোন গুরুত্ব পায় না । ফলে তারাপ্রসন্নের অর্থ উপার্জনের স্বপ্ন ধূলিস্যাৎ হয় । ঋণভারে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে স্ত্রীর পঞ্চম সন্তান সম্ভাবনার সংবাদে সে ঘরে ফিরে আসে । স্বামীর এই চরম ব্যর্থতাকে স্ত্রী বাইরের সংসারের লোকের দুষ্ট চক্রান্ত বলে মনে করে । অবশেষে পঞ্চম কন্যাসন্তান 'বেদান্তপ্রভা'র জন্ম দিয়ে স্বামীকে শতরূপে শতবার সৎ-উপদেশ শুনিয়ে সে দেহত্যাগ করে ।

১২৯৮ সনের অগ্রহায়ণ থেকে 'সাধনা' পত্রিকায় একাদিক্রমে ১৩০১ সনের কার্তিক পর্যন্ত সর্বমোট ৩৬টি গল্প প্রকাশিত হয়। প্রথম গল্পটি 'খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন'। এই গল্পগুলির মধ্যে যেগুলির মধ্যে নারীভাবনার বিশেষ বিশেষ দিক পরিস্ফুট হয়েছে সেগুলি এখানে আলোচিত হচ্ছে।

'দালিয়া' (১২৯৮) গল্পের মূল চরিত্র দালিয়া হলেও তাকে কেন্দ্র করে গল্পে দুই নারী চরিত্র জুলিখা এবং আমিনাকে পাই। সপ্তদশ শতকের ইতিহাস সম্রাট সাজাহানের মধ্যম পুত্র সুজার দুই কন্যা। তার পিতার আরাকানের রাজার হাতে মৃত্যু হয়। জুলিখা দীর্ঘদিন পরে ছোট বোন আমিনার সঙ্গে মিলিত হয়। সে আমিনাকে দিয়ে পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে চায়। কিন্তু আমিনা এক ধীবরের ঘরে পালিতা। সভ্য সমাজের বাইরের প্রকৃতির নির্জন প্রাঙ্গণে আরাকানের জনমানবহীন পরিবেশে আমিনা মুগ্ধ ও পরিতৃপ্ত। তার এই মুগ্ধতার মূলে রয়েছে যুবক দালিয়ার আন্তরিক মধুর সম্পর্ক। জুলিখা প্রথম দিকে দালিয়াকে অপছন্দ করলেও প্রকৃতির এই নির্জন মোহময় পরিবেশে সেও মায়ামুগ্ধ হয়। অবশেষে আরাকানরাজের সঙ্গে আমিনার বিবাহ প্রস্তাব আসে। বিবাহের এই সুযোগে দুইবোন পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নিতে চায়। তবে আমিনার পাশাপাশি জুলিখাও যেন প্রভাবিত হয়। তারও আমিনা ও দালিয়ার সহজ আন্তরিক প্রেমের সম্পর্ককেই যুদ্ধ-হিংসার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলে মনে হয়। কিন্তু ঘটনা এগিয়ে যায়। বিবাহের পর আমিনা যখন রাজপুত্রকে ছুরিকাঘাতে উদ্যত তখনই জুলিখা আবিষ্কার করে এই রাজা স্বয়ং দালিয়া। হিংসা দিয়ে যে কাহিনী শুরু হয়েছিল প্রেমের মাধুর্যে তার অবসান হয়।

নারী-ভাবনা প্রকাশের ক্ষেত্রে 'কঙ্কাল' (১২৯৮) গল্পটি উল্লেখযোগ্য। অসাধারণ সৌন্দর্যের অধিকারিণী এই গল্পের মেয়েটির বাল্যকালেই বিবাহ হয়। শ্বশুরবাড়ীর লোকের আচরণ ও অত্যাচারে তার বিবাহিত জীবন অতিষ্ঠ ছিল। কারণ স্বামী ছিল তার কাছে যমের মতো ভয় উৎপাদনকারী এক 'অপরিচিত জীব'। বিবাহের দুই মাসের মধ্যেই এই স্বামীর মৃত্যু হয়। শ্বশুরবাড়ীর লোকজন মেয়েটিকে 'বিষকন্যা' অপবাদে অপমান করে। এরপর সে বালবিধবার বেশে পুনরায় পিতৃগৃহেই ফিরে আসে। জীবনভীরু, উদাসীন, নিঃসঙ্গ, দাদার সংস্পর্শে জীবনানুরাগী মেয়েটির দিন কাটতে থাকে। বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে সে নিজের অতিব সৌন্দর্যে আত্মসচেতন হয়ে ওঠে। এই সৌন্দর্য-মুগ্ধতা তার কথাতেই প্রকাশ পায় -- "আমি যখন চলিতাম তখন আপনি বুঝিতে পারিতাম যে একখণ্ড হীরা নড়াইলে তাহার চারিদিক হইতে যেমন আলো ঝকমক করিয়া উঠে আমার দেহের প্রত্যেক গতিতে তেমনই সৌন্দর্যের ভঙ্গি নানা স্বাভাবিক হিল্লোলে চারিদিকে ভাঙিয়া পড়িত। আমি মাঝে মাঝে অনেকক্ষণ ধরিয়া নিজের হাত দুখানি নিজে দেখিতাম -- পৃথিবীর সমস্ত উদ্ধত পৌরুষের মুখে রাশ লাগাইয়া মধুরভাবে বাগাইয়া ধরিতে পারে এমন দুখানি হাত।" অর্থাৎ হীরার মতই তীব্র শাণিত প্রখর সৌন্দর্য বিশিষ্ট ছিল সে। এই যৌবন সৌন্দর্যে সে যেন অহংকারী এক মোহিনী নারী হয়ে উঠেছিল।

ভাগ্যবিড়ম্বিতা এই যুবতী বিধবা নারীটির নিঃসঙ্গ ব্যর্থ জীবনে স্বপ্নপুরুষ হয়ে আবির্ভূত হয় তার-ই দাদার বন্ধু ডাক্তার শশিশেখর। স্বাভাবিক জীবনসুখ- সংসর্গ বঞ্চিতা বিধবা যুবতীটি মনে মনে শশিশেখরকে প্রেমিকরূপে কামনা করে। তার অন্তঃপুরচারিণী নারী জন্মের বিকাশ ও সম্পূর্ণতার সার্থকদৃশ্য রচনা করে চলে। শশিশেখর মেয়েটির প্রতি দুর্বলচিত্ত হলেও একটি বিধবা মেয়েকে পুনর্বিবাহ করে সামাজিক সংস্কার-বিধি অগ্রাহ্য করার মতো দৃঢ় ব্যক্তিত্বপূর্ণ ছিল না। উপরন্তু পণের বারোহাজার টাকা দাবী নিয়ে

সে গোপনে অন্যত্র বিবাহ স্থির করে। শশিশেখরের এই বিবাহের ঘটনায় বিধবা মেয়েটির যৌবনের সাজানো স্বপ্নসৌধ ভেঙে চুরমার হয়ে পড়ে। চরম হতাশায় ও ব্যর্থতায় তার প্রেম প্রতিহিংসার পথে ধাবিত হয়। ফলে বিবাহের রাতেই মেয়েটি তার কল্পনার ঐশ্বর্যময়-পুরুষ স্বামীকে বিষ খাইয়ে হত্যা করে। এভাবে বাস্তব জীবনে যে প্রেম অসার, মুক্তির ঠিকানা এনে দেয় না, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সেই প্রেম-সৌন্দর্যের মিলন-শয্যা রচিত হয়। প্রেমের এই হিংসাত্মক লীলার উদাহরণ রবীন্দ্রসাহিত্যের অন্যান্য নারী চরিত্রে প্রায় বিরল। যদিও এই চিন্তা চেতনার সঙ্গে রবীন্দ্র চেতনার সাদৃশ্য নেই। প্রেমানুরাগী উন্মুখ নারী হৃদয় প্রেমের ব্যর্থতায় ও অপমানে কী ভয়ানক হয়ে উঠতে পারে মেয়েটির মধ্য দিয়ে সেই বাস্তব রূপ ফুটিয়ে তুললেন।

'কঙ্কাল' গল্পে আমরা যে সমাজ পরিচয় পেলাম সেখানে বিধবার পুনর্বিবাহ বা সংসারী হবার দিকটি প্রায় উপেক্ষিত ছিল। রবীন্দ্রনাথ এই বিধবা মেয়েটির বিপর্যস্ত মনের যন্ত্রণার দিকটি অতিপ্রাকৃত পরিবেশের আড়ালে মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের দ্বারা ফুটিয়ে তুললেন।

'মুক্তির উপায়' (১২৯৮) গল্পটিতে হৈমবতী ফকিরচাঁদের স্ত্রী। ফকিরচাঁদ অল্প বয়স থেকেই ধর্মপ্রাণ রাশভারী অতি গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ। আর হৈমবতী অল্পবয়সী জীবননিষ্ঠ নারী। সে গল্প উপন্যাস পড়তে ভালোবাসে। প্রচলিত প্রথায় সে স্বামীকে পূজনীয় মনে করে না। স্বামীর কাছে সে আনন্দ, হাসিতে ভরা স্বাভাবিক জীবন অনুরাগ প্রত্যাশা করে। তার এই স্ত্রীসুলভ আচরণকে সন্ন্যাসী স্বামী ধর্মের অনুশাসনে কঠোরভাবে দমন করে। এরপর সংসারের উন্নতি করতে না পেরে ফকিরচাঁদ গৃহত্যাগ করে। আবার এগল্পে মাখনলালের দুই বিবাহিতা স্ত্রীর পরিচয় পাই।

মাখনলাল একাধিক সন্তান ও সংসারের দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেতে সংসার ছেড়ে চলে যায়। ফলে অন্দরমহলের এই নারীদের সাংসারিক জীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। গল্পের শেষে ব্যঙ্গ ও কৌতুকময় পরিস্থিতিতে এই দুই পুরুষই সংসারে ফিরে আসে। ফকিরচাঁদ যে স্ত্রীকে চরম অবহেলায় এতদিন দূরে রেখেছিল, গল্পের পরিণতিতে তাকে দেখে তার মনে হল -- ''মূর্তিমতী মুক্তি স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত।''

'ত্যাগ' (১২৯৯) গল্পে কুসুম 'অনাথা, শৈশব-বিধবা, সুন্দরী এক কায়স্থ কন্যা'। হেমন্ত কলকাতার কলেজে পড়াকালীন কুসুমের প্রতি আকৃষ্ট হয়। কুসুমও স্বাভাবিক হৃদয়বৃত্তি অনুসারে হেমন্তের প্রতি প্রেমাসক্ত হয়। হেমন্তের প্রতিবেশী প্যারীশঙ্কর ঘোষাল একসময়ে তার প্রতি কৃত অন্যায়ের প্রতিশোধ নেবার দরুণ কুসুমের জাত পরিচয় অজ্ঞাত রেখে এই দুই প্রেমাসক্ত যুবক যুবতীর বিবাহ নিষ্পন্ন করেন। তাদের সুখী দাম্পত্য জীবনে আজ সমাজ-নির্দিষ্ট জাতিভেদ প্রথার কুসংস্কার প্রধান বাধা রূপে দেখা দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কুসুমের আলোড়িত হৃদয়-চিত্ত গল্পে আমরা পাই। কুসুম উপলব্ধি করেছে সমাজের নিয়মের কাছে নারী হৃদয়ের গভীর প্রেম, অসীম ভালোবাসা সবই ভঙ্গুর, তুচ্ছ ও মূল্যহীন। সামাজিক এই কুসংস্কারের কাছে অসহায় কুসুমের মানসিকতা এতে ব্যক্ত হয়েছে - -- ''কেবল, পৃথিবীকে এবং ভালোবাসাকে আগাগোড়া মিথ্যা এবং শূন্য বলিয়া মনে হইল। এমন-কি হেমন্তের সমস্ত অতীত ভালোবাসার কথা স্মরণ করিয়া অত্যন্ত নীরস কঠিন নিরানন্দ হাসি একটা খরধার নিষ্ঠুর ছুরির মতো তাহার মনের এক ধার হইতে আর-এক ধার পর্যন্ত একটি দাগ রাখিয়া দিয়া গেল। বোধ করি সে ভাবিল, যে ভালোবাসাকে এতখানি বলিয়া মনে হয়, এত আদর, এত গাঢ়তা - যাহার তিলমাত্র বিচ্ছেদ এমন মর্মান্তিক, যাহার মুহূর্তমাত্র মিলন এমন নিবিড়ানন্দময়, যাহাকে অসীম অনন্ত বলিয়া মনে হয়, জন্মজন্মান্তরেও যাহার অবসান কল্পনা করা যায় না -- সেই ভালোবাসা এই! এইটুকুর উপর নির্ভর। সমাজ যেমনি একটু আঘাত করিল অমনি অসীম ভালোবাসা চূর্ণ হইয়া

একমুষ্টি ধূলি হইয়া গেল।'' কিন্তু কুসুমের এই সমস্ত আশঙ্কার অবশেষে অবসান ঘটেছে। কারণ হেমন্ত সামাজিক সংস্কারের কাছে সাময়িকভাবে বিধ্বস্ত হলেও পরিণতিতে যথার্থ শিক্ষিত, যুক্তিবাদী, হৃদয়বান পাত্রের মতই সিদ্ধান্ত নিয়েছে -- ''আমি স্ত্রীকে ত্যাগ করিব না' এবং 'আমি জাত মানি না'। অর্থাৎ প্রকৃত শিক্ষিত ব্যক্তিত্বপূর্ণ পুরুষই পারে সমাজে নারীকে তার অসহায় অবমাননার হাত থেকে রক্ষা করতে। 'ত্যাগ' গল্পে লেখক সেটাই দেখালেন।

'জীবিত ও মৃত' (১২৯৯) গল্পে কাদম্বিনী মধ্যবয়সী পতি-পুত্রহীনা এক নিঃসঙ্গ গৃহবধূ। রাণীহাটের জমিদার শারদাশঙ্করবাবুর এই ভাতৃবধূটির সংসারে একান্ত আপনার জন বলতে কেউ-ই ছিল না। তাই অবাঞ্ছিত আগাছার মতোই কাদম্বিনী সে সংসারে আশ্রিতা ছিল। কেবল শারদাশংকরের ছোটছেলেটির প্রতি তার মাতৃজনোচিত অকৃত্রিম অফুরন্ত স্নেহ-সুধা-রস পিপাসা সঞ্চিত ছিল। কারণ জন্মের পর ছেলেটির মা অসুস্থ থাকবার ফলে কাদম্বিনী-ই তাকে বড় করে তোলে। শ্রাবণের একরাতে কাদম্বিনী হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়ে। মৃত ভেবে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয় তাকে। সেখানে গিয়ে-ই সে বেঁচে ওঠে। জীবিত হলেও মৃত্যুর সংস্কার বশতঃ সে বাড়ি ফিরে যেতে দ্বিধা বোধ করে। ফলে সে পুরোনো সখী যোগমায়ার বাড়ীতে গিয়ে ওঠে। সেখানে অদ্ভুত আচরণ দ্বারা কাদম্বিনী তার জীবনকে আরও জটিল করে তোলে। কাদম্বিনী যোগমায়া সম্পর্কে ভাবে -- ''স্বামী এবং ঘরকন্যা লইয়া ও যেন বহুদূরে আর-এক জগতে আছে। স্নেহ-মমতা এবং সমস্ত কর্তব্য লইয়া ও যেন পৃথিবীর লোক, আর আমি যেন শূন্য ছায়া। ও যেন অস্তিত্বের দেশে আর আমি যেন অনন্তের মধ্যে।'' বলাবাহুল্য এসব উদ্ভট আচরণে যোগমায়ার কাছ থেকে বিশ্বাস হারিয়ে সে শ্বশুরবাড়ীতেই ফিরে আসে। তার উদ্দেশ্য খোকাকে একবার মাত্র চোখে দেখা। কিন্তু এখানে এসে খোকার মুখে পূর্বপরিচিত আদরের কাকীমা ডাক শুনেই কাদম্বিনীর হৃদয়ে যেন প্রাণের সাড়া জাগে। খোকার প্রতি পুনরায় স্নেহ উদ্বেলিত মাতৃত্বের সংস্কার ও কর্তব্য পালনের জন্য সে অনুভব করে -- সে মরেনি। -- ''খোকার ঘরে আসিয়া বুঝিতে

পারিল , খোকার কাকীমা তো একতিলও মরে নাই ।'' কিন্তু যে খোকার টানে এই নিঃসঙ্গ , মৃতপ্রায় রমণীটির বেঁচে থাকার করুণ ব্যাকুলতা , তাকেই যখন পরিবারের লোকেরা শোনায় হৃদয় বিদারক নির্মম বাণী -- ''ছোটবৌমা , এই কি তোমার উচিত হয় । সতীশ আমার বংশের একমাত্র ছেলে , উহার প্রতি তুমি কেন দৃষ্টি দিতেছ । আমরা কি তোমার পর -- যখন সংসার হইতে বিদায় লইয়াছ তখন এ মায়াবন্ধন ছিঁড়িয়া যাও -- আমরা তোমার যথোচিত সৎকার করিব ।'' এই নিষ্ঠুর অভিযোগে অসহায়া কাদম্বিনীকে মৃত্যুবরণ করতে হয় । আর মরবার আগে সে নিজের মাথা ফাটিয়ে প্রমাণ করে যায় সে মরেনি ।

সংসারের চরম বাস্তবতার টানাপোড়েনে অনেকসময় দাম্পত্য সম্পর্কের সুর কেটে যায় । 'স্বর্ণমৃগ' (১২৯৯) গল্পের মোক্ষদা সুন্দরী স্বামী বৈদ্যনাথ চক্রবর্তির অর্থ উপার্জনে একান্ত উদাসীন , উদ্যোগহীন মনোভাবে অত্যন্ত হৃদয়হীন , রূঢ় , নির্মম ও অসন্তোষ-পরায়ণ হয়ে ওঠে । একাধিক সন্তান পরিবেষ্টিত সংসারে নিত্য অভাব-অনটনে অস্থির হয়ে মোক্ষদা সুন্দরী স্বামীকে বিভিন্ন উপায়ে অর্থ রোজগার করতে প্রলুব্ধ করে । কিন্তু বিষয়বুদ্ধিহীন নিরুপায় সরল স্বামী সমস্ত দিক থেকেই ব্যর্থ প্রতিপন্ন হয় । মোক্ষদা সুন্দরীর কল্পনায় রচিত 'স্বর্ণমৃগ'-এর স্বপ্ন সম্পূর্ণ ভেঙে যাবার পর বৈদ্যনাথ অবশেষে গৃহত্যাগ করে । নারীর সাধারণ সংসার অভিমুখী বিষয়বুদ্ধি সম্পন্ন স্থূল রূপটি এ গল্পে অঙ্কিত হয়েছে ।

'রীতিমতো নভেল' (১২৯৯) গল্পে কাঞ্চীনগরের রাজকুমারী বিদ্যুন্মালা ও কাঞ্চীরাজের সেনাপতি ললিতসিংহের মধ্যে জীবিত অবস্থায় যে প্রেম-সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারেনি মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সেই প্রেম যেন সার্থক হয়ে উঠেছে ।

'জয়পরাজয়' (১২৯৯) গল্পে অপরাজিতা চন্দ্রবংশীয় রাজা উদয়নারায়ণের কন্যা। এই রাজসভার কবি শেখরের সহিত দাক্ষিণাত্য থেকে আগত কবি পুণ্ডরীকের কাব্যযুদ্ধ সংঘটিত হয়। বাকচাতুর্য, পান্ডিত্য, বুদ্ধিবল ও ছলাকলার কৌশলে পুণ্ডরীক রাজসভার সকলের মন মোহিত করে। কবি শেখরের সহজ-সরল-গভীর ভাবসমৃদ্ধ কাব্যবাণীর সৌন্দর্য সভার মানুষেরা এমনকি রাজাও যথার্থ উপলব্ধি করতে পারেননি। পান্ডিত্যের অভিনয় ও কচ-কচানিতে মুগ্ধ হয়ে রাজা পুণ্ডরীককেই বিজয়মাল্য পরিয়ে দেয়। অপমানিত শেখর গভীর দুঃখে আত্মহত্যা করে। তার মৃত্যুকালে স্বয়ং রাজকন্যা এসে নিজকণ্ঠের পুষ্পমাল্য পরিয়ে দিয়ে শেখর কবির ওপর যথার্থ সুবিচার করে।

এই গল্পে লেখক নারীকে প্রকৃত পক্ষে সুবিচারকের আসনে বসিয়েছেন। ভাব -গভীরতায়, কাব্যগুণে শেখর অনেক বড় মাপের কবি, কিন্তু তার সেই সুক্ষ্ম কাব্য গৌরবকে উপলব্ধি করবার মত অনুভব ক্ষমতা যেন সেই সভায় কারো ছিল না। রাজকন্যা তার গভীর অন্তর্দৃষ্টিতে তাই শেখরকেই শ্রেষ্ঠ বিবেচনা করেছে। এমনকি এ গল্পে রাজকন্যা অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে এসেও শেখরের কণ্ঠে জয়মাল্য পরিয়ে দিয়েছে। তাই এ গল্পের শেষে স্বাধীন বিচারবুদ্ধি সম্পন্ন আত্মসচেতন নারীর পরিচয় ফুটে উঠেছে।

'শুভা' (১২৯৯) প্রকৃতির কোলে লালিত প্রকৃতির বৈশিষ্ট্যে গঠিত কন্যা। সে কথা বলতে পারে না। প্রকৃতি-ই যেন শুভার হয়ে কথা বলে। ''নদীর কলধ্বনি, কোলাহল, মাঝির গান, পাখীর ডাক, তরুর মর্মর-ধ্বনি; সমস্ত মিশিয়া চারিদিকের চলাফেরা-আন্দোলন-কম্পনের সহিত এক হইয়া সমুদ্রের তরঙ্গরাশির ন্যায়, বালিকার চিরনিস্তব্ধ হৃদয় উপকূলের নিকট আসিয়া ভাঙিয়া পড়ে।''

মূককন্যা সুভা প্রকৃতির উদার , উন্মুক্ত আশ্রয়েই শান্তি ও সান্ত্বনার বাণী খুঁজে পেয়েছিল । কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকেও সামাজিক বিধি নিষেধের বিধানে সত্য গোপন রেখে বিবাহ দেওয়া হয় । ফলে তার জীবনে গভীর ট্র্যাজেডি নেমে এল । স্বামীর কাছ থেকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে পরিত্যক্ত হল সে । লেখক শুভার সেই অন্তর্বেদনাকে বর্ণনা করে ব্যঙ্গের দ্বারা বাস্তব জীবনচিত্রকে ফুটিয়ে তুললেন -- ''বালিকার চিরনীরব হৃদয়ের মধ্যে একটা অসীম অব্যক্ত ক্রন্দন বাজিতে লাগিল -- অন্তর্যামী ছাড়া আর কেহ তাহা শুনিতে পাইল না । এবার তাহার স্বামী চক্ষু এবং কর্ণের দ্বারা পরীক্ষা করিয়া এক ভাষাবিশিষ্ট কন্যা বিবাহ করিয়া আনিল ।'' শুভা একেই বোবা তার উপর স্বামীর সংসারে উপেক্ষিতা বিবাহিতা এক নারী ; কাজেই তার জীবনের পরিণাম অত্যন্ত করুণ হয়েছে ।

কৌলিন্য প্রথা ও সহমরণ প্রথার বীভৎস বাস্তব রূপ নিয়ে 'মহামায়া' (১২৯৯) গল্পটি রচিত । এই দুই কু-প্রথার কবলে পড়ে মহামায়ার জীবনে করুণ ট্র্যাজিক পরিণতি নেমে এলেও প্রতিকূল সামাজিক পরিস্থিতিতেও রবীন্দ্রনাথ মহামায়াকে অনমনীয় , দৃঢ় চরিত্র ও ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যময়ী নারীরূপে অঙ্কিত করেছেন । কঙ্কাল গল্পের মেয়েটির মতই মহামায়া অতীব সুন্দরী , সৌন্দর্য সচেতন নারী । এই সৌন্দর্য রাশির সঙ্গে কৌলিন্যের সংস্কার তার নারী মনে প্রবল আত্মবিশ্বাস ও আত্মশক্তি সঞ্চার করেছে । গল্পের শুরুতেই পাই তার ব্যক্তিত্বের উজ্জ্বল বর্ণনা -- ''মহামায়া কুলীনের ঘরের কুমারী । বয়স চব্বিশ বৎসর । যেমন পরিপূর্ণ বয়স , তেমনি পরিপূর্ণ সৌন্দর্য । যেন শরৎকালের রৌদ্রের মত কাঁচা সোনার প্রতিমা -- সেই রৌদ্রের মতোই দীপ্ত এবং নির্ভীক ।'' এই সৌন্দর্য ও কৌলিন্য সংস্কার , বয়সোচিত বিকাশ তাকে আত্মবিশ্বাসী ও প্রবল আত্মমর্যাদাপূর্ণ করে তুলেছে । এই সঙ্গে জুড়ে গেছে তার স্বাধীনচেতা ইচ্ছা বলিষ্ঠ দৃঢ় জেদ , যেমন -- ''মহামায়ার মাথা মহামায়ার নিজের নিয়মানুসারেই নড়ে ; আর কাহারও সাধ্য নাই তাহাকে আপন মতে বিচলিত করে ।''

গল্পে রাজীব মহামায়ার বাল্যকালের সঙ্গী। মনে মনে সে মহামায়াকে ভালোবাসলেও অকুলীন রাজীবকে বিবাহ করে কুলের গৌরব মহামায়া যেন হারাতে পারে না। আসলে সে সময়কালে একক নারীর পক্ষে একই সঙ্গে পরিবার ও সমাজের বিধি নিষেধ উপেক্ষা করা সহজ ছিল না, তাই প্রথমতঃ মহামায়াকে দাদার দেওয়া কুলীন বিবাহকে মেনে নিতে হয়েছে। কিন্তু মহামায়া তার বাস্তব অভিজ্ঞতা ও বিচার বুদ্ধিতে এও জানে যে তার কিরূপ বিবাহ হতে পারে। তাই ভাঙা মন্দিরে দাদার সম্মুখেই রাজীবকে সে জোর গলায় তার মনের কথা জানিয়ে দেয় -- "রাজীব, তোমার ঘরেই আমি যাইব। তুমি আমার জন্য অপেক্ষা করিয়ো।"

মৃত্যুপথ যাত্রী বৃদ্ধের সঙ্গে বিবাহের পরদিনই মহামায়া বিধবা হয়। সতীদাহ প্রথার চির কালিমা অঙ্গে নিয়ে ঘোমটায় মাথা ঢেকে মহামায়া রাজীবের ঘরেই ফিরে আসে। রাজীবের সঙ্গে অবগুণ্ঠণের আড়াল নিয়ে সংসার করবার শর্ত দিল সে। রাজীব এই শর্তেই রাজী হল। এখন তারা উভয়ে একত্রে থাকে। কিন্তু এই ঘোমটার ব্যবধান রাজীবের কাছে ক্রমশঃ দুঃসহ হয়ে উঠল। তাই রাজীব একরাতে তার শর্ত ভুলে যায়। সেই মুহূর্তেই মুখে ঘোমটা টেনে, রাজীবের সমস্ত অনুরোধ উপেক্ষা করে চিরদিনের মত মহামায়া ঘর থেকে বের হয়ে যায়। আসলে রহস্য দিয়ে, শর্ত মেপে জীবন বেশীদিন চলতে পারে না। তাই যে রাজীব অতীতের মহামায়ার সৌন্দর্যে মুগ্ধ ছিল, তাকে ভালোবেসেছিল, সেই রাজীবের কাছে অর্দ্ধদগ্ধ বীভৎস রূপ প্রকাশ পাবার পর রাজীবের মনে মহামায়ার সেই মহিমা স্বাভাবিকভাবেই হ্রাস পাবে। আবার উভয়ের মধ্যে ভালোবাসা থাকলেও কাছে থেকে তাকে পলে পলে দুঃখ দেবার চেয়ে সংসার ত্যাগ করাই উচিৎ বলে মহামায়া মনে করেছে ; অর্থাৎ রাজীবের প্রতি মহামায়ার বিরাগের মূলেও তার গভীর অনুরাগই কাজ করে যায়। রাজীব তবু বেঁচে থাকল কিন্তু মহামায়ার পক্ষে সেই পথ আরও ভয়ঙ্কর।

এভাবে 'মহামায়া' গল্পে অষ্টাদশ শতকের কুখ্যাত কৌলিন্য প্রথা ও সতীদাহ প্রথার দ্বারা প্রভাবিত নারীর জীবন , সমস্যা ও তার বাস্তব পরিচয় আমরা পেলাম। মনীষী রামমোহন রায়ের নিরলস প্রচেষ্টায় ১৮২৯ খ্রীস্টাব্দে লর্ড উইলিয়াম ক্যাভেন্সিস বেন্টিঙ্ক-এর শাসনকালে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ হয়। কিন্তু এই কুপ্রথার দ্বারা একসময়ে বহু নারীর জীবন বিনষ্ট হয়েছে , তারই জলন্ত উদাহরণ রবীন্দ্রনাথ এ গল্পে তুলে ধরলেন। জীবন সম্পর্কে অত্যন্ত আশাবাদী , আত্মসচেতন ও আত্মমর্যাদা সম্পন্ন বলিষ্ঠ নির্ভীক নারী ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী হয়েও সমাজ সংস্কারের কাছে মহামায়া হেরে গেল। তবুও যুগের পরিপ্রেক্ষিতে তার যে একক সংগ্রামী মনোভাব সেটুকুই মহামূল্যবান।

'দান প্রতিদান' (১২৯৯) গল্পে একই পরিবারের দুই গৃহবধূ ব্রজসুন্দরী ও রাসমণির অর্থ-সম্পত্তি , বিষয়-আশয় সম্পর্কিত কলহ , মেয়েলি সংস্কারের পরিচয় প্রকাশিত। এই দুই নারী এখানে সংসারকেন্দ্রিক , বাস্তববুদ্ধি সম্পন্ন , কখনো মুখরা , কখনো প্রেমময়ী রূপে চিত্রিত।

মাতার মৃত্যুর পর বালিকা কন্যা প্রভা সম্পাদক পিতার প্রতি গভীর স্নেহ , নিপুণ সেবা , অপরিসীম প্রেম ও ত্যাগে যে মাতৃত্ব জনোচিত কর্তৃত্বময়ী রূপ ধারণ করেছে 'সম্পাদক' (১৩০০) গল্পে নারীর সেই রূপ ফুটে উঠেছে।

আমাদের সমাজে এক পুরুষের দুবার বিবাহ সর্বজন স্বীকৃত হলেও এর মধ্যে নারীর যে অপমান ও বঞ্চনার দিকটি দেখা যায় , 'মধ্যবর্তিনী' (১৩০০) গল্পে প্রধান নারী চরিত্র হরসুন্দরীর

সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বাস্তব অভিজ্ঞতা ও জীবন বিশ্লেষণের দ্বারা রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরেছেন । মাত্র আট বছর বয়সে হরসুন্দরীর সঙ্গে অল্পবয়সী চাকুরীজীবি সদ্যযুবা নিবারণ চন্দ্রের বিবাহ হয় । তাদের সুদীর্ঘ আঠারো - উনিশ বছরের দাম্পত্য জীবন একান্ত প্রথাগত নিয়মে বৈচিত্র্যহীন , একঘেয়েমিতে কেটে যায় । নিঃসন্তান এই দম্পতির জীবনে আনন্দ উচ্ছ্বাসের কোন অবকাশ ছিল না । এমন সময় হরসুন্দরী কঠিন অসুখে পড়ে । স্বামীর তৎপরতায় , ডাক্তারের ওষুধে দীর্ঘ রোগভোগের পর সে সুস্থ হয়ে ওঠে । সুস্থ হবার পর দুর্বলা স্ত্রীর কৃতজ্ঞতায় প্রেমে , ত্যাগে ও সর্বোপরি সন্তান সঙ্গ দ্বারা স্বামীকে সুখী করার বাসনা জাগে । এই উদ্দেশ্যে সে নিজেই উদ্যোগী হয়ে স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহ দেয় শৈলবালা নামে একটি ছোটখাটো মেয়ের সঙ্গে । প্রথম প্রথম হরসুন্দরীর প্রতি কর্তব্য-প্রেম বজায় রাখতে নিবারণ শৈলবালাকে আড়াল করতে চাইলেও অল্পকিছুদিনের মধ্যেই এই সদ্য বিবাহিতা স্ত্রীর প্রতি তার নব অনুরাগ জেগে ওঠে । এর কারণ পূর্বের বাল্যবিবাহের ফলে তাদের অপরিপক্ক দেহ-মনে প্রেমের বিকাশ প্রথম বিবাহিত জীবনে প্রায় অসম্পূর্ণ থেকে গিয়েছিল । পূর্ণ যৌবনে পৌঁছে প্রেমের লীলাচাঞ্চল্যে ও কলাকৌশলে অভিজ্ঞ নিবারণ চন্দ্র শৈলবালাকে যেন নূতন রূপে , নূতন আলোয় নতুন ভাব ও আনন্দে আস্বাদন করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে । শৈলবালার প্রতি এই অতিরিক্ত আকর্ষণ ও অনুরাগবশতঃ নিবারণ চন্দ্র স্বাভাবিকভাবেই হরসুন্দরীর প্রতি উদাসীন হতে থাকে । এরপর হরসুন্দরী স্বামীর কাছে তার মূল্য ও গুরুত্ব হারাতে থাকে । নিবারণ নির্লজ্জের মতো অফিস কামাই করে , গোপনে শৈলবালাকে নিয়ে নিরিবিলিতে প্রণয়স্বর্গ রচনা করে । এমনকি হরসুন্দরী শৈলবালাকে গৃহকাজ শেখাতে চাইলে নিবারণ তাতে বাধা দেয় । অপমানে সে নিজেই সমস্ত সংসারের কর্তব্যভার হাতে তুলে নেয় । এদিকে নববিবাহিতা শৈলবালা নিত্যনূতন চাহিদা ও আবদারে স্বামীকে সম্পূর্ণ নিঃস্ব করে ফেলে । কোম্পানীর টাকা চুরির দায়ে নিবারণ ধরা পড়ে । এই বিপদের দিনেও শৈলবালা হরসুন্দরীর দেওয়া গয়না দিয়ে স্বামীকে সাহায্য করতে অস্বীকৃত হয় । বাধ্য হয়ে নিবারণ বসতবাটি বিক্রি করে কোনমতে হাতকড়ার থেকে উদ্ধার পায় । এইসময়ে গর্ভবতী শৈলবালা অসুস্থ হয়ে পড়ে । হরসুন্দরী প্রাণাতিপাত

সেবা করেও তাকে বাঁচাতে পারে না। শৈলাবালার মৃত্যু নিবারণ ও হরসুন্দরীর দাম্পত্য জীবনে এক গভীর জিজ্ঞাসার চিহ্ন এঁকে দিয়ে যায়। এভাবে এ গল্পে রবীন্দ্রনাথ দেখালেন চরম আত্মত্যাগ ও একান্ত আত্মপ্রিয়তা কোনটাই নারীজীবনের পূর্ণতা সাধনের পক্ষে সহায়ক নয়।

একটি গ্রাম্য, নিম্নবিত্ত সমাজের অশিক্ষিত, সহজ সরল যুবতীর আত্মসম্মানবোধ ও নারীত্বের মর্যাদা যে কত তীব্র ও প্রবল হতে পারে 'শাস্তি' (১৩০০) গল্পে চন্দরা চরিত্রের বর্ণনায় সেই ভাবনারই সার্থক রূপায়ণ ঘটেছে।

চন্দরা প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর সতেরো-আঠারো বছরের তরুণী। কালোকালো গোলগাল হৃষ্টপুষ্ট মুখ তার। নাতিদীর্ঘ আঁটসাঁট শরীর। তার সুস্থ সবল নমনীয় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কোথাও বাধা পেত না। একটি নূতন তৈরী ছোট নৌকার মত স্বচ্ছ সহজ গতিময়। শরীরের পাশাপাশি মনটিও সদা সচেতন। সববিষয়ে কৌতুক, কৌতূহল। একইভাবে ছিদামও অত্যন্ত বলিষ্ঠ পুরুষ। অল্পবয়সে চন্দরা ও ছিদামের বিবাহ হয়। এই দুই নরনারীর মধ্যে শারীরিক ও মানসিক সঙ্গতি যথেষ্ট ছিল। বস্তুতঃপক্ষে তাদের দাম্পত্য জীবন ছিল সুস্থ, সুন্দর ও আনন্দময়। প্রেম-গভীরতাই মাঝে মাঝে দুই যুবক-যুবতীর মনে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের দোলাচলাবস্থা সৃষ্টি করত। দেবতা জ্ঞানে নয়, চন্দরা স্বামীকে মানবিক দৃষ্টিতেই দেখত। বুদ্ধিমতী, দৃঢ়চেতা এই যুবতী নারীর সঙ্গে ছিদাম সম্পূর্ণ পেরে উঠত না।

একদিকে জগৎ সংসার-এর প্রতি চন্দরার ছিল স্বাভাবিক আকর্ষণ, সে ছিল যথার্থ জীবন রসিক ও গভীর জীবন-তৃষ্ণা

সম্পন্না নারী । সংসারে জা-এর সঙ্গে তার ঝগড়া হলেও অত্যন্ত সংযম ও কৌশলে সে বরাবর জিতে যেত । আসলে নিম্নবিত্ত পরিবারের নারী হলেও আত্মমর্যাদাবোধে ও আত্মসচেতনতায় সে পরিপূর্ণ ছিল । স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে যখন সংঘাত চলছিল তখনই তাদের পরিবারে বড়ভাই দুখিরাম কর্তৃক তার স্ত্রী রাধার নির্মম হত্যা ঘটনাটি ঘটে । ছিদামের অবচেতন মনের আহত পৌরুষ এই সুযোগে চন্দরার ওপর প্রতিশোধ নিতে চায় । স্ত্রীর ব্যক্তিত্ব-কে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে রামলোচন চক্রবর্তীর কাছে ছিদাম বলে , " ঠাকুর , বউ গেলে বউ পাইব , কিন্তু আমার ভাই ফাঁসী গেলে আর সে ভাই পাইব না ।" প্রেমাস্পদ স্বামীর মুখে এরূপ মিথ্যা খুনের দায়ে বাইরের লোকের কাছে দোষী সাব্যস্ত হওয়ার প্রস্তাবে চন্দরা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে পড়ে । বিশেষ করে "বউ গেলে বউ পাইব " -- কথাটির মধ্যে নারীর প্রতি যে চরম অপমান , অবমাননা ও অসম্মানের দিকটি ব্যক্ত হয়েছে চন্দরার অভিমানী নারীসত্ত্বা তাতেই অপমানিত বোধ করেছে । গল্পের বিভিন্ন ঘটনায় আমরা চন্দরার মধ্যে হার মানতে না জানা এক দৃঢ় চিত্তের নারীর পরিচয় পেয়েছি । যেমন তার জা-র মন্তব্য -- "ও মেয়ে ঝড়ের আগে ছোটে , উহাকে আমি সামলাইব । আমি জানি , ও কোনদিন কী সর্বনাশ করিয়া বসিবে ।" ছিদামও লক্ষ করেছে 'এক অঞ্জলি পারদকে মুষ্টির মধ্যে শক্ত করিয়া ধরা যেমন দুঃসাধ্য , এই মুষ্টিমেয় স্ত্রীটুকুকেও কঠিন করিয়া ধরিয়া রাখা তেমনি অসম্ভব -- সেও যেন দশ আঙ্গুলের ফাঁক দিয়া বাহির হইয়া পড়ে ।" অর্থাৎ স্বামীকে সে যথার্থ ভালোবাসলেও নিছক মানবিক সংস্কার তার মধ্যে কাজ করেছে । তাই স্বামীকৃত সকল অন্যায় আচরণের সে বিরোধিতা করেছে । কিন্তু আজ এই ভয়ানক খুনের দায়ে আরোপিত চন্দরা শুধু স্বামীর কাছে নয় সমস্ত গ্রামের লোকের কাছে কলঙ্কিতা বলে পরিচিত হয়েছে , এই মিথ্যা কলঙ্ক ও তীব্র অপমানের চেয়ে মৃত্যু তার কাছে মহান । বিশেষতঃ যে স্বামী তাকে এই অবস্থায় ঠেলে দিয়েছে তার মুখ শেষবারের মত দেখতেও সে চরম ঘৃণা ও সংকোচ অনুভব করেছে । তাই স্বেচ্ছা মৃত্যু বরণের মধ্য দিয়ে সে প্রতিবাদ করতে চেয়েছে । মৃত্যুকালে ছিদামের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক শেষ করে আদালতে গিয়ে নির্ভয়ে বলেছে -- "হাঁ , আমি খুন করিয়াছি ।" স্বামীর সমস্ত চেষ্টা ,

ইচ্ছা , অনুরোধ উপেক্ষা করে আদালতে উকিলের প্রাণদণ্ড মুক্তির প্রয়াসকে অগ্রাহ্য করে শেষ পর্যন্ত চন্দরা তার আত্মসম্মান রক্ষা করেছে ।

'সমাপ্তি' (১৩০০) গল্পে অবাধ্য , দুরন্ত উচ্ছল প্রকৃতির কিশোরী মৃন্ময়ীর সংসারী হয়ে ওঠার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে । আমাদের সংসারে মেয়েরা অযত্ন ,অবহেলা ,অনাদরে লালিত হলেও যথার্থ শিক্ষিত হৃদয়বান পুরুষের সান্নিধ্যে নারীর জীবন প্রেমে গৌরবে সার্থক হয়ে উঠতে পারে । সমাপ্তি গল্পে মৃন্ময়ী পিতা ঈশানচন্দ্র মজুমদারের আদরের একমাত্র কন্যাসন্তান । সে গ্রামের আর পাঁচটি সাধারণ মেয়ের মতো নয় । শ্যামবর্ণা , ছোট কোঁকড়া চুল ছাঁটা , তার বড় বড় দুটি চোখে মেয়েলি লজ্জা , ভয় , দ্বিধার প্রকাশ নেই । দীর্ঘ , পরিপুষ্ট শরীরে বয়সের ছাপ নেই , বালকদের সঙ্গেই তার যত খেলা , পাড়াগাঁয়ের সমবয়সী মেয়েদের সে অবজ্ঞার চোখে দেখে । সে যেন প্রকৃতির কন্যা , লেখকের ভাষায় -- "যে দেশে ব্যাধ নাই , বিপদ নাই , সেই দেশের হরিণশিশুর মতো নির্ভীক ।" পাড়াগাঁয়ের এই চঞ্চলা ব্যতিক্রমী সৌন্দর্য ও স্বভাবের অধিকারিণী উচ্ছল মেয়েটিকেই বি-এ পরীক্ষোত্তীর্ণ যুবক অপূর্বকৃষ্ণ রায় বিবাহযোগ্যা পাত্রী হিসাবে পছন্দ করে । অপূর্বের এই ইচ্ছাকে গ্রামের সকল লোকেরা নিন্দা ও ভয়ের সহিত বিচার করে । অপূর্বের বিধবা মাতা পুরোনো সংস্কারে বিশ্বাসী । তাই তিনি ছন্নছাড়া প্রকৃতির মেয়েকে ছেলের বউ করার দাবি সহজে মানতে পারেননি । কিন্তু শেষপর্যন্ত শিক্ষিত ছেলের যুক্তি , জেদ , ও দৃঢ় -মানসিকতার কাছে মায়ের মন হার মানে । আসলে অপূর্বকৃষ্ণকে লেখক প্রকৃত শিক্ষিত সংস্কার মুক্ত উদার মনের চরিত্র রূপে গড়ে তুলেছেন । তাই মায়ের আদেশ মেনে সে মেয়ে দেখতে গেলেও সেখানকার সাজানো , গোছানো রঙ করা জড় পুত্তলিবৎ কনেটিকে বিবাহ করতে সে মনে মনে বাধা অনুভব করেছে । পাশাপাশি মৃন্ময়ীর উচ্ছল , স্বচ্ছ , সরল প্রাণময় স্বতন্ত্র সৌন্দর্য ও ব্যক্তিত্বের আকর্ষণেই অপূর্ব মুগ্ধ হয়েছে । এমনকি শিক্ষিত ও সহানুভূতিশীল হবার দরুণ অপুর্ব বিবাহের পরেও মৃন্ময়ীর স্বভাবসুলভ অবাধ্য

ছেলে -মানুষি , স্বাধীন ইচ্ছাকে মেনে নিয়েছে । নববিবাহিতা স্ত্রীর আনন্দের জন্য অপূর্ব তাকে তার পিতার কাছে নিয়ে গেছে । এভাবে মৃন্ময়ীর সকল দোষ-ত্রুটি , আবদার ও ইচ্ছাকে অপূর্ব গভীর প্রেমের দ্বারা সংশোধন করে নিয়েছে । বালিকা মৃন্ময়ী অপুর্বর উপস্থিতিতে তার ভালবাসাকে উপলব্ধি করতে পারেনি । কিন্তু বিরহেই তার প্রেম হৃদয়ের একূল - ওকূল দুকূল ছাপিয়ে বয়ে চলেছে । সে বালিকাবস্থা থেকে যেন যুবতী নারী সত্ত্বায় উপনীত হয়েছে । অবশেষে এই দুই নরনারীর দাম্পত্য প্রেমের মিলনমধুর সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে ।

'খাতা' (১৩০০) গল্পটিতে মধ্যবিত্ত বাঙালি শিক্ষিত পরিবারে উমার জন্ম । শৈশব থেকেই উমা লেখাপড়ায় আগ্রহী , কল্পনাবিলাসী , আবেগপ্রবণ , ভাবুক প্রকৃতির বালিকা । উমার হৃদয়ে যেন কবি রবীন্দ্রনাথেরই অধিষ্ঠান । তাই লিখতে পড়তে শিখে উমা 'জল পড়ে , পাতা নড়ে' কিংবা 'কালো জল , লাল ফুল' -- এইসব ছড়ার ছন্দে ও আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে । তার এই আনন্দময়তা শুধু মুখে মুখেই প্রকাশ পায় না , বাড়ীর প্রত্যেক দেওয়ালেই , বাবার হিসাবের খাতায় , সর্বত্রই সে এখন আঁক কেটে বেড়ায় । অবশেষে না বুঝে সে একদিন দাদা গোবিন্দলালের খাতায় লিখে বসল -- 'গোপাল বড় ভালোছেলে , তাহাকে যাহা দেওয়া যায় সে তাহাই খায় ।' দাদা নিজে একজন পত্রিকার নিয়মিত লেখক হয়েও কিন্তু উমার লেখার আগ্রহটুকু অনুভব করতে পারে না । এই অনধিকার সাহিত্যচর্চার শাস্তিস্বরূপ ক্রুদ্ধ দাদা উমাকে মেরে , কাঁদিয়ে , তার খাতা কলম সব কেড়ে নেয় । অপমানিতা , নাবালিকা উমা তার অপরাধের কারণটুকুও বুঝতে পারে না । যে দাদা স্বয়ং কাগজে লেখালেখি করে সেও বোনের লেখার প্রতি সহানুভূতিহীন নির্মম আচরণ করে । এরপর অবশ্য দাদাই স্নেহবশতঃ উপহার স্বরূপ উমাকে একটা 'লাইনটানা , বাঁধানো খাতা' এনে দেয় । এই খাতাখানি এখন হয়ে ওঠে উমার সর্বক্ষণের সঙ্গী । খাতা কোলে নিয়েই সে স্কুলে যায় , দিনের বেলা সবসময় সেটিকে সে

কাছে রাখে , রাত্রে শোবার সময় বালিশের পাশে রাখে । প্রথম বছর , দ্বিতীয় বছর -- তার ভালোলাগা অনেক গদ্য-পদ্য এতে স্থান পেতে থাকে । কিন্তু উমার এই আনন্দ অনুভবের শিক্ষা সম্পূর্ণ হতে না হতেই নয় বছর বয়সেই উমাকে বিবাহ দেওয়া হয় । আর বিবাহের সঙ্গে সঙ্গেই তার পড়াশুনার দিকটি সম্পূর্ণ উপেক্ষিত হয় । বিদায়কালে শ্বশুরবাড়ীতে কিভাবে চলতে হবে তা জানিয়ে উমাকে সাবধান করা হয় , যেমন -- দেওয়ালে আঁচড় না কাটা , স্বামীর খাতায় দাগ না দেওয়া , ইত্যাদি । এসব গুরুগম্ভীর উপদেশে হৃদকম্প নিয়ে উমা শ্বশুরবাড়ী উপস্থিত হয় । বলা বাহুল্য শ্বশুরবাড়ীর বিরুদ্ধ পরিবেশে উমা তার শখের খাতা খুলে দেখবার অবকাশ পায় না । কিন্তু তার বাড়ির যশিদাসী উমার বাপের বাড়ী ফিরে এলে পিতৃগৃহের বিচ্ছেদ যন্ত্রণায় উমার মন ব্যাকুল হয় । এই অব্যক্ত যন্ত্রণাকে ঘরের দরজা বন্ধ করে খাতায় সে লিখে রাখে -- 'যোশি বাড়ি গেছে , আমিও মা'র কাছে যাব ।' কিন্তু উমার এই লেখার সুখ অচিরেই বিনষ্ট হয় । উমার স্বামী প্যারীমোহনের কাছে তার তিন বোন এই ঘরে বসে লেখার কথাটি জানিয়ে দেয় । স্ত্রীর এই শিক্ষা লাভের সংবাদে প্যারীমোহনের মনে এক সংকীর্ণ অযৌক্তিক তত্ত্ব উদয় হয় -- " স্ত্রী শক্তি এবং পুং শক্তি , উভয় শক্তির সম্মিলনে পবিত্র দাম্পত্য শক্তির উদয় হয় ; কিন্তু লেখাপড়া শিক্ষার দ্বারা যদি স্ত্রী শক্তি পরাভূত হইয়া একান্ত পুং শক্তির প্রাদুর্ভাব হয় , তবে পুং শক্তির সহিত পুং শক্তির প্রতিঘাতে এমন একটি প্রলয় শক্তির উৎপত্তি হয় যদ্দারা দাম্পত্য শক্তি বিনাশ-শক্তির মধ্যে বিলীন সত্ত্বা লাভ করে , সুতরাং রমণী বিধবা হয় ।" পড়াশোনার জন্য স্বামীর কাছে ভৎর্সিত হবার পর উমা লজ্জায় দীর্ঘদিন আর খাতা ধরে নি ; কিন্তু বিবাহের পর বন্দিনী , সমস্ত ধরনের স্বাধীনতা সুখ বঞ্চিতা উমা শরতের এক সকালে ভিখারিণীর কণ্ঠে আগমনী গান শুনে অভিমানে উদাস , নস্ট্যালজিক হয়ে পড়ে । দ্বাররুদ্ধ করে খাতায় লিখে নেয় গান -- " পুরবাসী বলে উমার মা , / তোর হারা তারা এল ওই ।" ননদিনী রায়বাঘিনীদের উপদ্রবে পুনরায় এই খাতায় লেখার কথা প্যারীমোহনের কানে যায় । প্যারীমোহন এবার অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে খাতাটি কেড়ে নেয় । সেদিন থেকে উমা আর সে খাতাটি ফিরে পায়নি ।

নারীভাবনার ক্ষেত্রে 'মেঘ ও রৌদ্র' (১৩০১) গল্পে শশিভূষণ ও গিরিবালা একই গ্রামের দুই প্রতিবেশী। শশিভূষণ সদ্য বিকশিত এম . এ ,বি . এল । গিরিবালা শশিভূষণের কাছে লেখাপড়া চর্চা করে। শশিভূষণের নিঃসঙ্গ জীবনে সান্ত্বনার মতো এ গল্পে গিরিবালার উপস্থাপনা করা হয়েছে। গিরিবালা ও শশিভূষণের মধ্যে অসম মানের বন্ধুত্ব ও সুপ্ত ভালোবাসা থাকলেও বাস্তব জীবনে তাদের প্রেম সফল হয়নি। শশিভূষণ একদিকে পরাধীন দেশের বৃহৎ কর্মস্রোতে গা ভাসায় অপরদিকে দশবছর বয়সী গিরিবালার এক ধনীগৃহে বিবাহ হয়ে যায়। দীর্ঘ কয়েক বছর পর কারাগৃহ থেকে মুক্তি পেয়ে শশিভূষণ প্রথমে গিরিবালার গৃহেই আপ্যায়িত হয়। কিন্তু 'সেই ডুরে কাপড় পরা ছোটো মেয়েটি ' আজ 'নিরাভরণা শুভ্রবসনা বিধবা বেশধারিণী গিরিবালা।' অতীতের প্রেম মধুর স্মৃতির সম্পর্কের সূত্রেই গিরিবালা শশিভূষণকে সম্মান প্রদর্শন করেছে। শশিভূষণ ও গিরিবালার এই সম্পর্ক গল্পে সুস্পষ্টরূপে তুলে ধরা হয়নি। আসলে সমাজের বাস্তব ছবিই গিরিবালার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত। যে সময় অকাল বিবাহ ও বৈধব্য মেয়েদের জীবনে অভিশাপ বয়ে আনত , সেই অসময়ে ঝরে পড়া নারীর মতোই গিরিবালার বেদনা বিধুর মূর্তি এতে ফুটে উঠেছে।

'প্রায়শ্চিত্ত' (১৩০১) গল্পের বিন্ধ্যবাসিনী কলকাতা নিবাসী ধনী রাজকুমার বাবুর একমাত্র কন্যা। বিন্ধ্যবাসিনী ছিল অত্যন্ত নম্র , সুশীলা , শান্ত স্বভাববিশিষ্টা স্ত্রী। হিন্দু ধর্মানুযায়ী অল্পবয়সেই তার সঙ্গে পল্লিনিবাসী দরিদ্র , অযোগ্য , অপদার্থ , পাত্র অনাথবন্ধুর বিবাহ হয়। বিবাহের পর এই স্বামীর জন্য শত কষ্ট , অপমান , লাঞ্ছনা সহ্য করেও তার চিত্ত পতিভক্তিতে , প্রেমে , গভীর বিশ্বাসে গর্বিত হয়ে ওঠে। সংসার অনভিজ্ঞা , সৎ প্রকৃতির এই স্ত্রীটিকে চরিত্রহীন স্বামীর সান্নিধ্যে বারবার অপমানিত হতে হয়েছে। চক্ষুলজ্জাহীন স্বামী

বিলেতে যাবার উদ্দেশ্যে গোপনে শ্বশুরের টাকা চুরি করে পালিয়ে যায়। কিন্তু তবু বিন্ধ্যবাসিনী স্বামীর কোন দোষ দেখতে পায় না। যদিও এর ফলে পিতৃগৃহে বিন্ধ্যবাসিনীর আত্মসম্মানবোধ ম্লান হয়ে যায়। লেখকের বর্ণনায় তার করুণ অসহায় অবস্থার পরিচয় পাই -- "যে বিন্ধ্য বাপের কাছে কখনো অর্থ প্রার্থনা করিতে পারে নাই এবং যে স্ত্রী স্বামীর লেশমাত্র অসম্মান পরমাত্মীয়ের নিকট হইতেও গোপন করিবার জন্য প্রাণপণ করিতে পারিত, আজ একেবারে উৎসবের জনতার মধ্যে তাহার পত্নী অভিমান, তাহার দুহিতৃসম্ভ্রম, তাহার আত্মমর্যাদা চূর্ণ হইয়া প্রিয় এবং অপ্রিয়, পরিচিত এবং অপরিচিত সকলের পদতলে ধূলির মত লুণ্ঠিত হইতে লাগিল।"

এইভাবে বিন্ধ্যবাসিনী স্বামীর সকল অপরাধ, কলঙ্ক নিজমাথায় সগৌরবে ধারণ করে। বিলেতে যাবার পর নিজের সমস্ত গয়না দিয়ে স্বামীকে সে সাহায্য করে। অনাথবন্ধু স্ত্রীর এই চরম আত্মত্যাগের বিন্দুমাত্র মূল্য দেয়নি। বিলেত থেকে এক ইংরেজ রমণীকে বিয়ে করে সে দেশে ফেরে।

'বিচারক' (১৩০১) গল্পে একসময়ের বালবিধবা এক পতিতা রমণীর নিঃস্বার্থ, পবিত্র, নিষ্কলুষ প্রেম মাহাত্ম তুলে ধরা হয়েছে। এগল্পে হেমশশী চোদ্দ-পনের বছরে বিধবা হবার পর পিতৃগৃহে ফিরে আসে। অতৃপ্ত অসংখ্য জীবনের আকাঙ্ক্ষা নিয়েও সংসারে নিত্য কাজে সে নিযুক্ত থাকত। তার বাড়ীর পাশেই থাকত কলেজের ছাত্র মোহিত মোহন দত্ত। মোহিত বিলাস বৈভবে, নারী - সঙ্গ সুখে, নৃত্য-গীত-বাদ্যে-সাহেবিয়ানায় বিশ্বাসী ছিল। নব্যবাবু বেশধারী, সুন্দর, সুবেশ, স্বাধীনতা সুখ প্রিয় -- এই যুবকটিকে মাঝে মাঝে জানালা দিয়ে দেখে হেমশশীর তাকে দেবতা বলে মনে হতো। এই নিঃসঙ্গ গৃহবর্তিনী, জীবনসুখ বঞ্চিতা মেয়েটি মনে মনে মোহিতকেই দেবতার আসনে বসিয়ে পূজা করতে থাকে। ক্রমশঃ এই সংসার অনভিজ্ঞা

মুগ্ধ বালিকার প্রতি মোহিতের লুব্ধ দৃষ্টি পড়ে। সে 'বিনোদচন্দ্র' ছদ্মনামে মেয়েটিকে পত্র লিখে প্রভাবিত করে। সেই প্রেমে সাড়া দিতেই হেমশশী এক গভীর রাতে 'বিনোদচন্দ্রের' সঙ্গে ঘর ছাড়ে। বিনোদচন্দ্র, ছদ্মবেশধারী মোহিত, তার কলুষিত কামনার চরিতার্থতা ঘটিয়ে নির্জনে এই বিধবা মেয়েটিকে পরিত্যাগ করে ফিরে যায়। অবশেষে সংসার বিচ্ছিন্না কুলভ্রষ্টা এই মেয়েটি এক পতিতা রমণীতে পরিণত হয়। তার নাম হয় ক্ষীরোদা। আটত্রিশ বছর বয়সে জীবনের প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে সহায় সম্বলহীনা নিঃস্ব ক্ষীরোদা আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে জীবনযন্ত্রণার অবসান ঘটাতে চায়। কিন্তু আত্মহত্যা করতে গিয়ে সে বেঁচে যায়। বিচারে তার ফাঁসীর হুকুম হয়। এক্ষেত্রে বিচারপতি স্বয়ং তার পূর্বজীবনের প্রেমিক-পুরুষ, আরাধ্য দেবতা 'বিনোদচন্দ্র'। ফাঁসীর পূর্বে মোহিতমোহন তাঁরই আংটির মধ্য দিয়ে আবিষ্কার করল হেমশশীকে — "..... তাহার পরে যখন ধীরে ধীরে মুখ তুলিলেন তখন তাঁহার সম্মুখে কলঙ্কিনী পতিতা রমণী একটি ক্ষুদ্র স্বর্ণাঙ্গুরীয়ের উজ্জ্বল প্রভায় স্বর্ণময়ী দেবী প্রতিমার মতো উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।"

'নিশীথে' (১৩০১) গল্পে আমরা নারী চরিত্র হিসাবে জমিদার দক্ষিণাচরণবাবুর মুখের বর্ণনায় দুই বিবাহিতা স্ত্রীর পরিচয় পাই। দক্ষিণাচরণবাবুর দাম্পত্য জীবন ও সম্পর্কের মধ্য দিয়ে এতে নারীর, বিশেষতঃ প্রথমা পক্ষের স্ত্রীর ব্যক্তিত্বমূল্য বর্ণনা করা হয়েছে। দক্ষিণাচরণবাবু অল্পবয়সেই সংসারধর্ম পালন করায় তার মন স্ত্রীকে কেবল গৃহিণী হিসাবে পেয়ে সন্তুষ্ট হতো না। কিন্তু এই প্রথমা স্ত্রীর ব্যক্তিত্বের প্রধান দিক ছিল নারীর সুগৃহিণীসুলভ সেবাময়ী কল্যাণমূর্তির প্রকাশে। এই স্ত্রীটির জীবনবোধ ও বাস্তবজ্ঞান প্রখর ছিল। বালিকাসুলভ লীলাচাপল্যের চেয়ে গৃহিনীসুলভ গাম্ভীর্যের অধিকারিণী ছিল এই নারী। সেই সঙ্গে বাক্-সংযমী এই স্ত্রীটির হাসবার অসাধারণ ক্ষমতা তার আত্মসচেতন, বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়। স্বামীর কঠিন অসুখের সময় এই নারী দিনরাত কঠোর পরিশ্রম ও অক্লান্ত সেবা দ্বারা স্বামীকে রোগমুক্ত করে তোলে। তার মৃত্যুর পর এই

চরম ত্যাগ , আদর্শ ও নিষ্ঠার পরিচয় স্বামীর কথাতেই প্রকাশিত -- ''রোগের সময় আমার স্ত্রী অহর্নিশি এক মুহূর্তের জন্য বিশ্রাম করেন নাই। সেই কটা দিন একটি অবলা স্ত্রীলোক মানুষের সামান্য শক্তি লইয়া প্রাণপণ ব্যাকুলতার সহিত , দ্বারে সমাগত যমদূত গুলার সঙ্গে অনবরত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহার সমস্ত প্রেম , সমস্ত হৃদয় , সমস্ত যত্ন দিয়া আমার এই অযোগ্য প্রাণটাকে যেন বক্ষের শিশুর মতো দুই হস্তে ঝাঁপিয়া ঢাকিয়া রাখিয়াছিলেন। আহার ছিল না , নিদ্রা ছিল না , জগতের আর কোন কিছুর প্রতি দৃষ্টি ছিল না।'' আবার স্ত্রীর চরম অসুস্থতার দিনে স্বামীর সামান্য সেবায় সে বলে -- ''পুরুষ মানুষের অতটা বাড়াবাড়ি ভালো নয়।'' দক্ষিণাচরণের মতে তার স্ত্রী তাকে ''যুক্তাক্ষরহীন প্রথম ভাগ শিশু শিক্ষার মতো অতি সহজে বুঝিতেন।'' তাই অসুস্থা স্ত্রীর পাশে স্বামী যখন রোমান্টিক ভাব ব্যাকুলতায় বলে -- ''তোমার ভলোবাসা আমি কোনো কালে ভুলিব না।'' তখন-ই স্ত্রীর লজ্জা , সুখ , অবিশ্বাস ও পরিহাসের তীব্রতা মিশ্রিত হাসিতে জানিয়ে দেয় -- ''কোনো কালে ভুলিবে না , ইহা কখনো সম্ভব নহে এবং আমি তাহা প্রত্যাশাও করি না।'' এই হাসির মধ্য দিয়া স্ত্রীর গভীর মানব চরিত্র জ্ঞান ও বাস্তবতাবোধের পরিচয় পাই। আবার বায়ুপরিবর্তনে গিয়ে হারান ডাক্তারের মরণাপন্ন স্ত্রীর উদ্দেশ্যে বলা অমানবিক মন্তব্যগুলি দক্ষিণাচরণবাবুর প্রথমা স্ত্রীর মনে তীব্র অভিমান জাগিয়ে তোলে। তাই সে বলে -- ''ডাক্তার , কতকগুলো মিথ্যা ঔষধ গিলাইয়া ডাক্তারখানার দেনা বাড়াইতেছ কেন। আমার প্রাণটাই যখন একটা ব্যামো , তখন এমন একটা ওষুধ দাও যাহাতে শীঘ্র এই প্রাণটা যায়।''

এরপর অন্যের প্ররোচনায় অসুস্থা স্ত্রী আত্মহত্যার মধ্য দিয়ে চরম আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। এমনকি মৃত্যুকালে অসহ্য যন্ত্রণাতেও স্বামীর প্রতি তার গভীর সান্ত্বনা ও স্নেহের বাণী ব্যক্ত করলেন -- ''শোক করিয়ো না , ভালোই হইয়াছে , তুমি সুখী হইবে , এবং সেই মনে করিয়া আমি সুখে মরিলাম।'' এভাবে নারীর জননী মূর্তির পরিচয় এ গল্পে ফুটে উঠেছে।

পাশাপাশি মনোরমা এ গল্পের দ্বিতীয় নারী , যার ব্যক্তিত্বে প্রেয়সী ভাবের পরিচয় পাই । আসলে গল্প কাহিনী অনুযায়ী দক্ষিণাচরণবাবুর প্রথমা স্ত্রীর ব্যক্তিত্বগৌরবের কাছে মনোরমার গুরুত্ব ম্লান হয়ে গেছে ।

'আপদ' (১৩০১) গল্পের কিরণ দাম্পত্য সম্পর্কে সুখী , সন্তুষ্ট এক কোমল স্নেহময়ী বালিকা-বধূ । অত্যন্ত আমোদপ্রিয় ও মিশুকে স্বভাবের জন্য সে গ্রামের সবার প্রিয় । অসুস্থ অবস্থায় বায়ুপরিবর্তনের জন্য সে চন্দননগরে যায় । সেখানে নীলকান্ত নামে মাতৃহীন চোদ্দ - পনের বছরের এক ব্রাহ্মণ সন্তানকে কুড়িয়ে পায় । নীলকান্ত ক্রমে কিরণের স্নেহে , কৌতুকে ও ভালোবাসায় পুষ্ট হতে থাকে । নীলকান্তকে সন্তানহীনা কিরণ স্নেহ করলেও তার শাশুড়ী ও স্বামী এই বালকটিকে যথোচিত স্নেহ ও মর্যাদার চোখে দেখত না । ফলে ইচ্ছা থাকলেও কিরণ শেষ পর্যন্ত নীলকান্তকে কাছে রাখতে পারেনি । দেবর - স্বামী - শাশুড়ী পরিবেষ্টিত এক গ্রামের বালিকাবধূ রূপে কিরণ এ গল্পে অঙ্কিত । যার কর্তৃত্ব-কে ও ব্যক্তিত্বকে কেউ বড় করে দেখে না , নিতান্ত পারিবারিক গৃহবধূ রূপেই এতে সে রূপায়িত ।

বিবাহিত জীবনে নারীর প্রতি চরম অত্যাচারের আর এক কাহিনী 'দিদি' (১৩০১) গল্পটি । এ গল্পে দীর্ঘ ষোল বছর ধরে শশীকলা ও তার স্বামী জয়গোপালের দাম্পত্য জীবন সম্পর্ক রচিত হয়েছে অথচ কর্তব্যবোধ , প্রেম ও সন্তানস্নেহ কোনোকিছুই শেষ পর্যন্ত শশীকলাকে সংসারে স্থায়ী করতে পারল না । আসলে বিবাহের পর শ্বশুরের কাছে প্রভূত সম্পত্তি পাবার আশায় সন্তুষ্ট ছিল শশীকলার

স্বামী জয়গোপাল। কিন্তু বেশী বয়সে ভ্রাতৃরূপী শ্যালক নীলমণির জন্ম হওয়ায় এই দম্পতির জীবনে অশান্তি ঘনিয়ে আসে। অল্প বয়সে মা মারা যাবার পর দিদির কাছেই এই ছোটো ভাইটি আশ্রয় নেয়। আবার ভাইয়ের দুবছর বয়সেই শশীকলার পিতা মারা যায়। ফলে বিষয় সম্পত্তি সহ এই শ্যালক ভাইটি জয়গোপালের কাছেই সম্পূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করে। জয়গোপাল কৌশলে এই নাবালক নীলমণির সম্পত্তি অপহরণ করে। স্বামীর এই ঘৃণ্য চক্রান্ত ও আচরণ শশীকলা মেনে নিতে পারে না। যদিও বিবাহিত জীবনের প্রথম দিকে সে স্বামীকে দেবতা জ্ঞানে বিশ্বাস করেছে। কিন্তু ভ্রাতৃপ্রীতিতে উজ্জ্বল শশীকলা স্বামীর এই অন্যায় আচরণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে। এই মাতৃহীন শিশুটির প্রতি যথার্থ ন্যায় সাধনের জন্য শশীকলা তৎকালীন ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছেও আবেদন জানায়। হৃদয়বান সাহেব তাকে সুবিচারের আশ্বাস দেয়। ভাই-এর নিরাপত্তার জন্য ভাইকে সাহেবের কাছে সমর্পণ করে নিশ্চিন্ত মনে স্বামীর ঘরেই সে ফিরে আসে। জয়গোপাল স্ত্রীর এই প্রতিবাদী আত্মসচেতন নারীসত্ত্বাকে মেনে নিতে পারে না। সম্পত্তির লোভে নিজ স্ত্রীকে গোপনে হত্যা করে।

'মানভঞ্জন' (১৩০২) গল্পের গিরিবালা প্রথম পর্বের অধিকাংশ গল্পের মধ্যে ব্যতিক্রমী নারী চরিত্র রূপে অঙ্কিত। পতিগৃহে চরম অমর্যাদা ও অপমানের উর্দ্ধে আত্মসম্মান উদ্ধারে অভিনব উপায় অবলম্বন করেছে সে এ গল্পে।

উনিশ শতকের কলকাতায় আবির্ভূত ধনী ব্যবসায়ী পরিবারের গৃহবধূ অসাধারণ সৌন্দর্যময়ী গিরিবালা গোপীনাথ শীলের স্ত্রী। গিরিবালা নিজেও প্রথম থেকে এই সৌন্দর্যরাশি নিয়ে অত্যন্ত সচেতন। লেখকের বর্ণনায় -- ''মদের ফেনা যেমন পাত্র ছাপিয়া পড়িয়া যায়, নবযৌবন ও নবীন সৌন্দর্য তাহার সর্বাঙ্গে তেমনই ছাপিয়া পড়িয়া

যাইতেছে। -- তাহার বসনে ভূষণে, গমনে, তাহার বাহুর বিক্ষেপে, তাহার গ্রীবার ভঙ্গিতে, তাহার চঞ্চল চরণের উদ্দাম ছন্দে, নূপুরনিক্কণে, কঙ্কণের কিঙ্কিণীতে, তরল হাস্যে, ক্ষিপ্র ভাষায়, উজ্জ্বল কটাক্ষে একেবারে উচ্ছৃঙ্খলভাবে উদ্‌বেলিত হইয়া উঠিতেছে।''

লেখকের ভাষায় -- 'গিরিবালার সৌন্দর্য অকস্মাৎ আলোকরশ্মির ন্যায়, বিস্ময়ের ন্যায়, নিদ্রাভঙ্গে চেতনার ন্যায়, একেবারে চকিতে আসিয়া আঘাত করে এবং এক আঘাতে অভিভূত করিয়া দিতে পারে। তাহাকে দেখিলে মনে হয়, ইহাকে দেখিবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। চারিদিকে এবং চিরকাল যেরূপ দেখিয়া আসিতেছি এ একেবারে হঠাৎ তাহা হইতে অনেক স্বতন্ত্র।'' গিরিবালা নিজেও তার এই সৌন্দর্য সম্পর্কে সচেতন ছিল। ধনীগৃহে তাকে কোন কাজ করতে হোত না। তার সন্তানাদি ছিল না, তাই চুল বেঁধে, শাড়ী পাল্টে, ছাদে বেড়িয়ে, দাসী সুধামুখীর সঙ্গ নিয়ে সে তার অফুরন্ত অবকাশ কাটাত। সংসারে তার সুখ ছিল না। কারণ স্বামী বাল্যকালে তাকে ভালোবাসলেও এই ভরা যৌবনে সে নিঃসঙ্গ, একাকী ও উপেক্ষিত। আসলে গোপীনাথ অল্পবয়সে পিতৃবিয়োগের ফলে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও অসৎ সঙ্গে চরিত্র ভ্রষ্ট। এই অল্পশিক্ষিত, চরিত্রহীন, অবিবেচক স্বামীর সংস্পর্শে গিরিবালার দাম্পত্য জীবন বিনষ্ট প্রায়। গোপীনাথ ঘরের স্ত্রীকে উপেক্ষা করে থিয়েটারের নটী লবঙ্গলতা ও বাইরের ইয়ারমহল নিয়ে ব্যস্ত। নির্লজ্জের মতো অত্যন্ত হৃদয়হীন ভাবে গোপীনাথ গিরিবালার কাছেও লবঙ্গলতার প্রশংসা করে। ফলে অপমানিতা গিরিবালা স্বামীর রক্ষণশীল নিষিদ্ধ মানসিকতা উপেক্ষা করে ঘরের বন্দিনী জীবন থেকে বেরিয়ে থিয়েটার দেখতে যায়। মঞ্চে অভিনীত 'মানভঞ্জন' পালার রাধার দুর্জয় মান গিরিবালার মনেও তীব্র অভিমানের পাহাড় সঞ্চয় করে। রঙ্গমঞ্চের আলোকসজ্জা, গানের সুর, গিরিবালার মনে এক নেশার সৃষ্টি করে। নির্জন, নিঃসঙ্গ, সৌন্দর্যহীন শয়নকক্ষ ছেড়ে গিরিবালা প্রায়ই রাতে এখন থিয়েটার দেখতে যায়। থিয়েটারের আলো ঝলমল পরিবেশ, গীত-বাদ্য, গিরিবালার মনে মুগ্ধতা ও বিস্ময় জাগিয়ে তোলে। এই

অভিনয় ক্ষমতার গুণে সে নিজেকে নতুনভাবে আবিষ্কার করে। অবহেলিতা গিরিবালার মনে অবশেষে চরম অপমানের ক্ষণ নেমে আসে বসন্তের এক রাতে। স্বামী সেদিন ঘরে ফিরে আসে। গিরিবালা প্রচন্ড আশায় বুক বাঁধে, আজ সে অভিনয় ক্ষমতায়, প্রেমে, আবেগে, আনন্দে ও গানে স্বামীকে অভিভূত করবে। কিন্তু তার সমস্ত আবেগ অনুরোধকে উপেক্ষা করে আলমারীর চাবি চায় গোপীনাথ। গিরিবালা চাবি না দেওয়ায় স্বামী তার গায়ের অলঙ্কার খুলে লাথি মেরে চলে যায়। এভাবে চরিত্রহীন, হৃদয়হীন স্বামীর কাছে নির্মমভাবে লাঞ্ছিত হয় গিরিবালার সচেতন নারী হৃদয়। এই অপমান যন্ত্রণা এত তীব্র যে আত্মহত্যার দ্বারাও তা মিটবে না। ফলে নিজের স্বাধীনসত্ত্বা এবং নারীমর্যাদাকে উদ্ধার করবার জন্য গিরিবালা নতুন উপায় অবলম্বন করে। স্বামীর ঘর-সংসার তথা বিবাহ-বন্ধন থেকে বেরিয়ে এসে জগৎমোহিনী নারীরূপ নিয়ে থিয়েটারের নটীর ভূমিকায় সে অবতীর্ণ হয়। এরপর স্বামীর সঙ্গে তার চূড়ান্ত সাক্ষাৎ ঘটে গান্ধর্ব থিয়েটারে মনোরমার ভূমিকায় অভিনয়কালে। থিয়েটারপ্রেমি স্বামীর দুর্বলতার জায়গাতেই আঘাত করে গিরিবালা তার অপহৃত আত্মমর্যাদা ও নারীত্বের গৌরব অর্জন করে নেয়। এভাবে পরাজিত হয় স্বামীর পৌরুষ মিশ্রিত অহংকার।

'ঠাকুরদা' (১৩০২) গল্পে কুসুম নয়নজোড়ের জমিদার কৈলাশচন্দ্র রায় চৌধুরীর নাতনী। ঠাকুরদার পাশাপাশি বালিকা কুসুমের ব্যক্তিত্বগৌরবকে রবীন্দ্রনাথ এতে তুলে ধরেছেন। ঠাকুরদার স্নেহধন্যা কুসুম তার প্রতি কর্তব্যে, দায়িত্বে মাতৃ স্বরূপা। ঠাকুরদার প্রতি প্রতিবেশী শিক্ষিত যুবকের মিথ্যা ছলনা ও প্রতারণাকে কুসুম মেনে নিতে পারেনি তাই অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে রোষের সঙ্গে সে বলেছে -- "আমার দাদামশায় তোমাদের কী করেছেন -- কেন এসেছ তোমরা।" একটি বালিকার এই প্রতিবাদী মনোভাবে ছোটলাট সজ্জিত যুবকটির মোহভঙ্গ হয়। এতদিন শিক্ষিতের যে অহংকারে অন্ধ হয়ে যুবকটি এই বালিকাটিকে বিবাহের অযোগ্যা বলে অবহেলা করে এসেছিল, বালিকাটির এই হার্দিক আচরণে তার সেই অভিমান অন্তর্হিত হয়। সে

উপলব্ধি করে নাক-কান ও পণের টাকাই নারীর মনুষ্যত্ব বিচারের মাপকাঠি নয় । ফলে কুসুমকে সে বিবাহের প্রস্তাব দেয় । এ গল্পে কুসুমের কোমল দয়াময়ী , দায়িত্বপূর্ণ নারীসত্ত্বা প্রকাশ পেয়েছে ।

'প্রতিহিংসা' (১৩০২) গল্পে প্রধান নারী চরিত্র ইন্দ্রাণী । অতীতে ইন্দ্রাণীর পিতামহ গৌরীকান্ত তার অনলস সেবা ও পরিশ্রম দ্বারা ক্ষুদ্র বিষয় সম্পত্তি থেকে মুকুন্দবাবুর জমিদারী অবস্থার প্রচলন করেন । এই পিতামহের ভাব আদর্শে অনুপ্রাণিতা ইন্দ্রাণী । হিন্দুসমাজের এক কুলীন বংশে ইন্দ্রাণীর জন্ম । কুলগৌরব রক্ষা করেই পিতামহ তার সঙ্গে শিক্ষিত পাত্র অম্বিকাচরণের বিবাহ দেয় । পিতামহের মতো ইন্দ্রাণীও প্রভুবংশের প্রতি উদার , আদর্শবাদী , ও বিশ্বাসী ছিল । তাই তার স্বামী আইন পাশ করলেও অন্যত্র ওকালতি করুক ইন্দ্রাণী তা কখনোই চায়নি । তাই প্রভুপরিবারের হিতসাধনে জীবন অর্পন করা যে তাদের কর্তব্য , এই ভাবটি তার মনে দৃঢ়বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল । কৌলীন্যের সংস্কার , অসাধারণ সৌন্দর্য , স্বাভাবিক গাম্ভীর্য , ও আত্মমর্যাদাবোধ ইন্দ্রাণীকে এ গল্পে যথার্থ ব্যক্তিত্বময়ী করে তুলেছে । প্রভু পরিবারের বিবাহের বৌভাতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে অকুলীন প্রভুপত্নী নয়নতারা ইন্দ্রাণীর ব্যক্তিত্ব গৌরবে ঈর্ষান্বিতা হয়ে তাকে অপমান করে । শান্ত মনে সহজভাবে ইন্দ্রাণী সেসব মেনে নিলেও মনিব বংশের মানুষের এই অকৃতজ্ঞতা ও অপমানে ইন্দ্রাণী বেদনাহত হয় । একমাত্র স্বামীর কাছে সে এই দুঃখের কথা জানায় । স্বামী অম্বিকাচরণ স্ত্রীর এই অপমানের ঘটনায় অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হন । তিনি তৎক্ষণাৎ তার প্রতিবিধান করতে চান । কিন্তু ইন্দ্রাণী উদার মনে সব দোষ ক্ষমা করে নেয় । এ গল্পে বিনোদবিহারীর স্ত্রী নয়নতারার অর্থলুব্ধ , কুটিল , সন্দেহপরায়ণ , ঈর্ষাকাতর , সংকীর্ণমনা স্বভাব ইন্দ্রাণীকে শান্তিতে থাকতে দেয় না । ইন্দ্রাণীর অর্থগৌরব ও ব্যক্তিত্বমহিমাকে সে সহ্য করতে পারে না । না বুঝেই স্বামীর বিরুদ্ধে সন্দেহ ঘনিয়ে তোলে । স্ত্রী নয়নতারার পরামর্শে বিনোদবিহারী অন্যায়ভাবে অম্বিকাচরণকেও অপমান করে । স্বামীর মিথ্যা অবমাননায় ইন্দ্রাণীর প্রতিশোধ স্পৃহা বেড়ে ওঠে । কিন্তু আকণ্ঠ ঋণভারে জর্জরিত হয়ে অসহায় বিনোদবিহারী যখন

নিরুপায়ভাবে অম্বিকাচরণের কাছেই বালকের মতো এসে কেঁদে পড়ে, ইন্দ্রাণী ক্ষমাসুন্দর উদার চিত্তের সান্নিধ্যে সমস্ত সংকীর্ণতা, সন্দেহ, অপরাধের অবসান ঘটে। প্রতিশোধ স্থাপনের মহৎ উপায়ে নিঃসন্তান ইন্দ্রাণী তার সমস্ত সঞ্চিত মহামূল্যবান অলংকাররাশি প্রভু বংশকে অকাতরে দান করে পুনরায় তাদের রক্ষা করে।

'দুরাশা' (১৩০৫) গল্পে এক কিশোরী নবাবকন্যার আজীবন প্রেম-তপস্যার ব্যর্থ করুণ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এ গল্পে বদ্রাওন কন্যা সুদীর্ঘ আটত্রিশ বছর ধরে ফৌজি অধিনায়ক হিন্দু ব্রাহ্মণ কেশরলালের আচারধর্মকেই তার অন্তরের স্বধর্ম বলে একান্ত বিশ্বাস করে তার বীরত্ব ও প্রেমে মগ্ন থাকে। জীবন সায়াহ্নে পৌঁছে চুয়ান্ন বছরের বিগত যৌবনা এই ব্যর্থ নারী অবশেষে অনুভব করতে পারে আচারধর্ম নিছক অভ্যাসের আভরণমাত্র। যে বিশ্বাস, প্রেম, উদ্যম কল্পনায়, সৌন্দর্যস্বপ্নে একটি ষোল বছরের জীবন অনভিজ্ঞা নবাব কিশোরী প্রেমের দুস্তর পথে অভিসার শুরু করেছিল, প্রিয়জনের কাছে পরম অবহেলায়, অনাদরে, চূড়ান্ত ব্যর্থতায়, আজ সে যাত্রা পথের সমাপ্তি ঘটল। প্রেমের আলোতেই, শক্তিতেই সে প্রতিদিন পথ চলেছিল, আজ পুরুষের হৃদয়হীন বাস্তব জীবনাচরণে সে উপলব্ধি করেছে — "প্রেম বলে কিছু নেই"। কারণ গল্পের পুরুষ প্রেমিকের মনে এই প্রেমের কোন মূল্য ছিল না। তাই আজ তার পথ চলবার শক্তিও নেই। যে প্রেম ও সংস্কার, ধ্রুবসত্যের মতো অনন্ত, অসীম আদর্শ হয়ে এতদিন তার অন্তরে অবস্থান করেছিল, আজ তার অবসান ঘটেছে। গল্পের শেষে নারীর প্রেমসংস্কার অভ্যাসধর্মের ওপর তাই প্রশ্ন তুলেছে।

বিবাহিত জীবনে নিরপরাধ নারীর প্রতি স্বামীর অন্যায় অত্যাচার ও অপমানের ভার যে কী ভয়ানক হতে পারে তার অতি বাস্তবোচিত উদাহরণ 'পুত্রযজ্ঞ' (১৩০৫) গল্পটি। অল্পবয়সী বিনোদিনীর সঙ্গে গ্রামের বিষয়-বুদ্ধি-সর্ব্বস্ব, শাস্ত্রপরায়ণ বিজ্ঞমনা

বৈদ্যনাথের বিবাহ হয়। 'পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা' -- এই নীতিতে বৈদ্যনাথ অন্ধবিশ্বাসী ছিল। কাজেই তার বিবাহিত জীবনে স্ত্রীর প্রতি ভাব-ভালবাসা , প্রেম ও হৃদয় বিনিময়ে কোন আস্থা ছিল না। বিবাহের অতি অল্পকালের মধ্যেই সন্তানের জন্ম না হবার জন্য বিনোদিনীকে স্বামী ও পরিবারের সকলের চোখে অপরাধী বিবেচনা করা হয়। পরিবারের লোকেদের কাছে দিনরাত লাঞ্ছনা-গঞ্জনা শুনে হাঁপিয়ে উঠত বিনোদিনীর বালিকা হৃদয়। এ থেকে মুক্তি পেতে মাঝে মাঝে সে পাশের বাড়ির গৃহবধূ কুসুমের সঙ্গে তাস খেলতে যেত। কিছুটা সময়ের জন্য সংসারযন্ত্রণা মুক্ত হয়ে সে এখানে থাকতে পারত। কুসুমের দেবর নগেন্দ্রনাথও মাঝে মাঝে তাদের তাস খেলায় অংশ নিত। খেলার ছলে নগেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিনোদিনীর মনেরও যেন কখন যোগ রচিত হয়। এই লঘু ক্রীড়া ছলেই একদিন কুসুমের অনুপস্থিতিতে নিরালায় নগেন্দ্রনাথ বিনোদিনীকে চুম্বন করে বসে। দুর্ভাগ্যবশতঃ এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে বৈদ্যনাথের বাড়ীর পরিচারিকা। সে বিনোদিনীর নামে মিথ্যা কলঙ্ক প্রচার করে। তুচ্ছ কারণে বিনোদিনী মিথ্যা কলঙ্কিনী বলে পরিচিত হল। স্ত্রীর চরিত্রের প্রতি বৈদ্যনাথ সন্দেহ , সংশয় ও ক্রোধ চতুর্গুণ বৃদ্ধি করে কঠিন আদেশ করল -- "কলঙ্কিনী , তুই আমার ঘর হইতে দূর হইয়া যা।" স্বামীর এই আদেশ উপেক্ষা করে গৃহে থাকবার মতো সাহস ও শক্তি বিনোদিনীর ছিল না। সে রাতেই সে অজান্তে স্বামীর সন্তান গর্ভে নিয়ে অজানা আশ্রয়ের খোঁজে বেরিয়ে পড়ে। সে প্রকৃত কোন আশ্রয় পেল কি না কেউ তার খোঁজ রাখল না। একে তো মিথ্যা কলঙ্কে কলঙ্কিনী নারী সে , তার উপর সন্তানবতী রমণী , তাকে সেই সমাজ আশ্রয় দেয়নি। এদিকে বৈদ্যনাথের বিষয় আশয় বৃদ্ধি পেয়েছে। কলকাতাতে বৃহৎ বাড়ি কিনে সে বাস করতে লাগল। সন্তান লাভের আশায় সে এরপর চার-চারটি বিবাহ করে। অথচ সন্তান জন্মায় না। শাস্ত্র প্রিয় বৈদ্যনাথ অবশেষে সন্তান লাভার্থে শাস্ত্রজ্ঞ পন্ডিতের পরামর্শে এক 'প্রচুর ব্যয়সাধ্য যজ্ঞের' আয়োজন করে। সেই উপলক্ষে সন্ন্যাসী ও ব্রাহ্মণেরা বহুকাল ধরে সেখানে নিশ্চিন্তে উদরপূর্তি করতে থাকে। সেখানে আবির্ভূত হয় এক 'জীর্ণদেহ বালক সহিত একটি অতি শীর্ণকায়া রমণী'। বৈদ্যনাথের বিবাহিতা স্ত্রী ও একমাত্র পুত্রসন্তান আজ তার-ই নির্মম আচরণ ও

অদূরদর্শিতায় পথের ভিখারিণী। পরিণতিতে রবীন্দ্রনাথ করুণ ব্যঙ্গচিত্রের মাধ্যমে এই ব্যঞ্জনাকে তুলে ধরলেন --"গুরু দয়াল আসিয়া বালক ও মাতাকে তাড়াইয়া দিল। সেই ক্ষুধাতুর নিরন্ন বালকটি বৈদ্যনাথের একমাত্র পুত্র। একশত পরিপুষ্ট ব্রাহ্মণ এবং তিনজন বলিষ্ঠ সন্ন্যাসী বৈদ্যনাথকে পুত্রপ্রাপ্তির দুরাশায় প্রলুব্ধ করিয়া তাহার অন্ন খাইতে লাগিল।"

বস্তুতঃ পক্ষে বিনোদিনীর কোন অপরাধই এ গল্পে নেই, অথচ তার নির্মম করুণ পরিণতি অঙ্কণে ও গল্পের বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ দেখালেন যেন বিনোদিনীর প্রধান অপরাধ এই যে সে একটি নারী। তাই বিবাহের পর থেকে শুরু করে সমগ্র গল্পে তার তীব্র অপমান, দুঃখ ও যন্ত্রণার দিকটি প্রকাশিত হল। এই একান্ত রক্ষণশীল পরিবারের স্বামী ও প্রতিকূল পরিস্থিতির বিরুদ্ধে ভীরু, অসহায় বালিকাবধূটির বিদ্রোহ করা সম্ভব ছিল না। তাই তার জীবনে করুণ ট্র্যাজিক পরিণতি নেমে আসে। এ গল্পে নারীকে পুরুষ তার প্রয়োজনে বারবার ইচ্ছেমত ব্যবহার করেছে।

অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসী ডিটেকটিভ স্বামীর ব্যক্তিত্বময়ী নিজ স্ত্রীর কাছেই হার মানবার মজাদার কৌতুকময় কাহিনী 'ডিটেকটিভ' (১৩০৫) গল্পটি। গল্পটি উত্তমপুরুষে নায়কের মুখে বর্ণিত হয়েছে।

মহিমচন্দ্র একসময়ে একান্নবর্তী পরিবারে দাদার অন্নে পরিপুষ্ট হলেও সেখানে স্ত্রীর সমাদরের অভাব হওয়াতে পরবর্তীকালে আত্মশক্তিতে নির্ভরশীল হয়ে দাদার আশ্রয় ত্যাগ করে স্বাধীন ব্যবসায় গড়ে তোলে। অর্থাৎ স্ত্রীর প্রতি দাম্পত্যজীবনে তার ভালোবাসা, সম্মান, ও দায়িত্ব কর্ত্তব্যবোধের কোন অভাব ছিল না

। অতঃপর মহিমচন্দ্র তার শ্রম ও বুদ্ধির বলে পুলিশের বিভাগ থেকে ক্রমশঃ ডিটেকটিভ পদে আসীন হয়। মহিমচন্দ্রের মনে একটি অহংকার ছিল এই যে সে তার 'সুন্দরী স্ত্রীকে' বশ করতে পেরেছে, স্ত্রী তার অধীনতা পাশে আবদ্ধ, স্ত্রীর স্বতন্ত্র স্বাধীন ইচ্ছা, কল্পনা ও চাহিদা কিছুই নেই। অর্থাৎ স্বামী তার প্রেম ও শাসনের দ্বারা স্ত্রীকে সম্পূর্ণভাবে আয়ত্বাধীন করতে পেরেছে। গোয়েন্দা মহিমচন্দ্র মানুষের স্বভাব, চরিত্র, আচরণ, গতিবিধি ও রহস্য উন্মোচনে নিজেকে অতিরিক্ত বিজ্ঞ বিবেচিত করত। তার মনে হোত -- 'আমাদের দেশের অপরাধীগুলা ভীরু এবং নির্বোধ, অপরাধীগুলা নির্জীব এবং সরল, তাহার মধ্যে দুরূহতা দুর্গমতা কিছুই নাই।'

তার এই মূঢ়তা ও ভ্রান্তবিশ্বাসকে ভেঙে দেয় স্বয়ং তার স্ত্রী ও তার পুরাতন প্রেমিক শ্রীমন্মথনাথ মজুমদার। ডিটেকটিভের স্ত্রী পূর্বে মন্মথনাথের শৈশবের সঙ্গী ছিল, মন্মথ তাকে ভালোবেসে বিবাহ করতে চাইলেও তারা উভয়ে সমবয়সী হবার দরুণ তাদের অভিভাবকেরা সেই বিবাহ হতে দেয়না। এরপর মহিমচন্দ্রের সঙ্গেই মন্মথের পূর্ব প্রেমিকার বিবাহ হয়ে যায়। মন্মথ বহু চেষ্টার পর কলকাতায় চাকুরীরত মহিমচন্দ্রের পূর্ণ ঠিকানা জোগাড় করে। এখন থেকে সে প্রায় সন্ধ্যাতেই পুরানো প্রেমিকার মুখখানি দেখার পরম আগ্রহে তার বাড়ীর সামনে দাঁড়িয়ে থাকত। সেখান থেকেই ডিটেকটিভ স্বামীর চোখে কলেজের অন্যমনস্ক এই ছাত্রের রহস্যময় এই আচরণ ধরা পড়ে। অবশেষে সেই ছাত্রের প্রতি ক্রমাগত অনুসন্ধান চালিয়ে সে আবিষ্কার করে এক সন্ধ্যায় পালকিতে চড়ে পুরানো প্রেমিকের অনুরোধ রক্ষার্থে তারই স্ত্রী শ্রীমন্মথনাথ মজুমদারের বাড়ীতে উপস্থিত হয়েছে। এভাবে সুস্থ সুখী দাম্পত্য জীবনে থেকেও স্বাধীন স্বতন্ত্র ইচ্ছা ও আচরণ দ্বারা এ গল্পের ডিটেকটিভ স্বামীর স্ত্রী তার সংস্কারমুক্ত সাহসী পরিচয় দিয়েছে। কথিত আছে 'স্ত্রী চরিত্র দেবা ন জানতি'। ডিটেকটিভ মহিমচন্দ্রের স্ত্রীও অত্যন্ত কৌশলে স্বামীর চোখকে ধূলা দিয়ে পূর্ব প্রেমিকের সহিত দেখা করেছে। এ গল্পে আসলে স্ত্রী-বুদ্ধির কাছে পুরুষের হার মানার দিকটি কৌতুকছলে লেখক তুলে ধরেছেন।

পাঁচটি পরিচ্ছদে লেখা 'অধ্যাপক' (১৩০৫) গল্পটিতে ব্রাহ্মধর্মাবলম্বি , উচ্চশিক্ষিতা উজ্জ্বল এক নারী-ব্যক্তিত্বের পরিচয় উদঘাটিত হয়েছে। বিদ্বান , জার্মান পণ্ডিত ও দার্শনিক ভবনাথ বাবুর কন্যা কিরণবালা বন্দ্যোপাধ্যায়। শৈশব থেকেই শিক্ষানুরাগী পণ্ডিত পিতার সংস্পর্শে কিরণবালার শিক্ষাচর্চা সর্বতোভাবে সার্থক হয়েছে। গল্পের বক্তা মহীন্দ্রবাবু এই ষোড়শী কিরণবালাকে সাধারণ নারীরূপেই মনে করেছিলেন , যে নিছক ঘর সংসারের সাধারণ অভিজ্ঞতা ও সংকীর্ণ জ্ঞানের সীমাতেই আবদ্ধ। আসলে কিরণবালা অতি শিক্ষিতা , বুদ্ধিমতী হলেও বিনয়ী , কোমল ও শান্তশ্রী স্বভাবের অধিকারিণী ছিল। তার সহজ সরল সংলাপ , হাসি ও বাস্তব বুদ্ধিতে তার বিদ্যা ও পাণ্ডিত্যের গভীরতার দিকটি এই নবীন লেখক বক্তা উপলব্ধি করতে পারেনি। কিরণকে নিয়ে মহীন্দ্র কুমারের আকাশ কুসুম কল্পনা ও কৌতুকময়তা গল্পের কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। কিন্তু কিরণবালা কলেজে আগত নবীন ব্রাহ্ম অধ্যাপক বামাচরণ বাবুর প্রণয়পাশে আবদ্ধ , কারণ ব্রাহ্ম ধর্মে বিবাহপূর্ব মেলামেশায় বাধা ছিল না। একদিকে উচ্চশিক্ষিত অধ্যাপক পিতা , অপরদিকে অধ্যাপক প্রেমিকের প্রেয়সী নারী কিরণবালা। ব্রাহ্ম ধর্মে বাল্যবিবাহ স্বীকৃত না থাকায় কিরণবালার বিদ্যাচর্চা ও ব্যক্তিত্বের বিকাশে উপযুক্ত পরিবেশ এ গল্পে রচিত হয়েছে। গল্পের পঞ্চম ও শেষ পরিচ্ছেদে কিরণবালার শিক্ষায় চূড়ান্ত সফলতা ও পাশাপাশি নবীন অহঙ্কারী পুরুষ সাহিত্যিকের বিফলতার পরিচয় পরিস্ফুট -- ''পরদিন সকালের ডাকে লাল পেন্সিলের দাগ দেওয়া একখানা স্টেট্‌স্‌ম্যান কাগজ পাওয়া গেল , তাহাতে বি . এ পরীক্ষার ফল বাহির হইয়াছে ; প্রথমেই প্রথম ডিবিশান কোঠায় কিরণবালা বন্দ্যোপাধ্যায় বলিয়া একটা নাম চোখে পড়িল ; আমার নিজের নাম প্রথম , দ্বিতীয় , তৃতীয় কোন বিভাগেই নাই।'' যে কিরণবালাকে গল্পকথক কিছুদিন গুটিকতক বই পড়িয়ে ইংরেজী কাব্যসাহিত্য সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা দিতে চেয়েছিল , সেই নারীর প্রকৃত পরিচয় হল -- ''কিরণবালা দর্শনশাস্ত্রে অনার লইয়াছেন এবং সাহিত্যে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ।''

আমাদের দেশে বিংশ শতকের প্রথম দশকে অনুষ্ঠিত স্বদেশীয়ানা ও দেশপ্রেমের জোয়ারে পুরুষের পাশাপাশি সংসারে নারীরাও যে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল 'রাজটীকা' (১৩০৫) গল্পের নারীচরিত্রদের এই বিশেষ স্বতন্ত্র মানসিকতার পরিচয় ফুটে উঠেছে।

এ গল্পে নায়ক নবেন্দুশেখর ইংরেজ সরকারের প্রদত্ত 'রায়বাহাদুর' খেতাব অর্জনের মোহে আত্মসম্মান বিসর্জন দিয়ে সাহেব সমাজকে সেলাম দিয়ে সামান্য প্রয়োজনে গভর্মেন্ট সম্পৃক্ত ব্যাপারে বৃহৎ পরিমাণ টাকা চাঁদা দিয়ে পরম গৌরব ও সন্তোষ অনুভব করত। কিন্তু দেশভক্ত পরিবারের কন্যা অরুণলেখার সঙ্গে বিবাহের পর স্ত্রীর প্রভাবে তার এই ইংরেজীয়ানার মোহ অপসৃত হতে থাকে। এই ব্যাপারে নবেন্দুশেখরের স্ত্রী অরুণলেখা ও তার তিন শিক্ষিত সুন্দরী শ্যালিকা লাবণ্যলেখা, কিরণলেখা ও শশাঙ্কলেখার সরস বুদ্ধিদীপ্ত কৌশল ও আচরণ নবেন্দুশেখরের নির্লজ্জ ইংরেজপ্রেমের অবসান ঘটায়। দাম্পত্য জীবনে সুখে সহাবস্থান করেও ভিন্ন মতাদর্শে বিশ্বাসী স্বামীকে জাতিবোধ ও দেশপ্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত করে এ গল্পের নারীচরিত্র স্বাধীনতা ও আত্মসম্মান বোধের যথার্থ পরিচয় দিয়েছে।

'মণিহারা' (১৩০৫) গল্পটিতে দাম্পত্য জীবনের আশ্রয়ে নারীর চির-অচেনা, অপরিচিতা, ভয়ানক, স্বতন্ত্র মূর্তি অঙ্কন করা হয়েছে। ইংরেজী শিক্ষিত নব্যবঙ্গীয় যুবক ফণিভূষণ সাহা পিতৃব্য অপুত্রক দুর্গামোহন সাহার কাছে উত্তরাধিকার সূত্রে বৃহৎ বিষয়-আশয় ও ব্যবসা করবার ছাড়পত্র পান। মণিমালিকা তার বিবাহিতা স্ত্রী। এক জটিল সম্পর্ক সূত্রে এই দম্পতির জীবন গ্রথিত ছিল। ফণিভূষণ স্ত্রীকে যথোচিত ভালোবাসলেও সে ভালোবাসার প্রকাশ ছিল সংযত,

উত্তাপহীন সুক্ষ্ম-কল্পনাজগতের। বিবাহের পর মণিমালিকার বিশেষ যত্ন ও সুবিধার্থেই ফণিভূষণ তাকে আত্মীয়সম্পর্কচ্যুত করে ব্যবসার স্থানে, নিজের কাছে রেখেছিল। কিন্তু এই একচ্ছত্র সঙ্গলাভে ও অধিকার পেয়ে মণিমালিকার মন ক্রমশঃ কোণঠাসা ও সংকুচিত হয়ে পড়ে। লেখকের বর্ণনায় দেখি মণিকার ''হৃদপিণ্ড বরফের পিণ্ড''। প্রায় পনেরো-ষোল বছরের দাম্পত্য জীবন যাপনের পরও যেন তার 'অনন্তকুমারীব্রত' ঘোচেনি। তাই স্বামীর অস্তিত্ব সে অন্তরের ভিতর অনুভব করে না। সন্তানহীনা হওয়ায় স্নেহ, প্রেম, মাতৃত্বের সংস্কারে তার দেহমন বিগলিত হয়ে ওঠেনি। সে কারো সঙ্গে মেলামেশা করত না, কারো জন্য চিন্তা করত না। ব্রত অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণ খাওয়ানো বা ভিখারীকে পয়সা দান করা -- এসব কিছুই সে করেনি। সঞ্চয় প্রবৃত্তির এই রমণী 'রক্তকরবী'-র যক্ষরাজের মতই দিন দিন প্রাণহীন, আনন্দহীন হয়ে উঠেছিল। সে শুধু কাজ করত ও সঞ্চয় করত। ফলে ''তাহার রোগ শোক তাপ কিছুই ছিলনা; অপরিমিত স্বাস্থ্য, অবিচলিত শান্তি ও সঞ্চীয়মান সম্পদের মধ্যে সে সবলে বিরাজ করিত।'' আসলে তার নারী সত্ত্বা সম্পূর্ণভাবে নিজস্ব স্বার্থে জড়িত ছিল, জগৎ সংসারের জন্য নিযুক্ত ছিল না।

ব্যক্তি স্বাতন্ত্রে বিশ্বাসী ফণিভূষণ ভেবেছিল, দানেই বুঝি প্রতিদান পাওয়া যায়, এই ভেবে সে মণিমালিকার 'শূন্য গহ্বর হৃদয়' ভরার জন্য হীরা, মুক্তার গয়না ঢালত, আর এসব কিছুতে মণিমালিকার শূন্য হৃদয় শূন্যই থাকত, কেবল তার লোহার সিন্দুক ভরে উঠত। স্বামীর কাছে ক্রমাগত পেয়ে পেয়ে মণিমালিকা তাকে ''যন্ত্রস্বরূপ জ্ঞান করিত; যন্ত্রটিও এমন সুচারু যে কোনদিন তাহার চাকায় একফোঁটা তেল জোগাইবারও দরকার হয় নাই।''

হঠাৎ ব্যবসাতে ফণিভূষণের দেড়লাখ টাকার প্রয়োজন হয়। মণিমালিকা স্বামীর এই চরম বিপদের দিনে স্বামীর হাতে গয়নার

বাক্স তুলে দিতে অরাজী হয়। কারণ সংসারে কোন মানুষ এমনকি স্বামীর প্রতিও তার বিশ্বাসের বড়ই অভাব ছিল। তার অন্তরের যত্নের ধন "যাহা প্রকৃতই সোনা, যাহা মানিক, যাহা বক্ষের, যাহা কণ্ঠের, যাহা মাথার --"। কাজেই নিছক মেয়েলি বুদ্ধিতে চালিত হয়ে সে গয়না বাঁচাতে ফণিভূষণের অনুপস্থিতিতে অসৎ মন্ত্রী মধুসূদনের পরামর্শে একাকিনী রাতে সমস্ত গয়না গায়ে পরে আপাদমস্তক কাপড়ে আবৃত করে পিত্রালয়ে যাত্রা করে নিজের জীবন বিপন্ন করে। অর্থাৎ জড় পদার্থের প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি মণিমালিকাকে মানসিক ব্যাধিগ্রস্ত করে তোলে ও তার জীবনে ট্র্যাজিক পরিণতি নেমে আসে। প্রথম পর্যায়ের গল্পধারায় মণিমালিকা এক ব্যতিক্রমী নারী চরিত্র।

হিন্দু নারীর আদর্শ, সংস্কার, সততা, প্রেম ও সতীত্বের সংস্কার নারীকে কী ভাবে মহিমান্বিত করে তোলে 'দৃষ্টিদান' (১৩০৫) গল্পে 'কুমুদিনী' চরিত্রে তা বিশ্লেষিত হয়েছে। এই গল্পটির বিষয়বস্তু প্রধান নারী চরিত্র কুমুদিনীর দৃষ্টিকোণ থেকেই বর্ণিত হওয়ায় নারীর নিজস্ব জগৎ, অনুভব ও চিন্তার প্রকাশে গল্পটির গুরুত্ব রয়েছে।

হিন্দুঘরের মেয়ে কুমুদিনীর মাত্র আট বছর বয়সে বিবাহ হয়। তার স্বামী অবিনাশ কুলীন পাত্র, পেশায় ডাক্তার। শিশুকাল থেকেই সে পূজার্চ্চনায়, ধর্মেকর্মে, দেবভক্তিতে বিশ্বাসী। তার ধারণা দেবতাকে সন্তুষ্ট করে সে শিবের মত বর পেয়েছে। কুমুদিনীর দাম্পত্য জীবন মোটামুটি সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের। চোদ্দ বছর বয়সে সে মৃত সন্তানের জন্ম দেবার পর থেকে অসুস্থ হয়ে পড়ে। মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে উঠলেও তার চোখের পীড়া দেখা দেয়। স্বামীর ভুল চিকিৎসাতেই তার চোখদুটি অন্ধ হয়ে যায়। স্বামী কুমুদিনীর অন্ধত্বের কারণে নিজ অপরাধ যখন স্বীকার করে তখন সে স্বামীকে

ক্ষমা করে দেয়। আত্মনিবেদনের ভাব ব্যাকুলতায় কুমুদিনী মনে মনে ভাবে -- "যখন পূজায় ফুল কম পড়িয়াছিল তখন রামচন্দ্র তাঁহার দুই চক্ষু উৎপাটন করিয়া দেবতাকে দিতে গিয়াছিলেন। আমার দেবতাকে আমার দৃষ্টি দিলাম -- আমার পূর্ণিমার জোৎস্না, আমার প্রভাতের আলো, আমার আকাশের নীল, আমার পৃথিবীর সবুজ সব তোমাকে দিলাম; তোমার চোখে যখন যাহা ভালো লাগিবে আমাকে মুখে বলিও, সে আমি তোমার চোখের দেখার প্রসাদ বলিয়া গ্রহণ করিব।" এভাবে ব্যক্তিগত বঞ্চনা, দুঃখকে শান্তি ও ভক্তি দিয়ে ঢেকে কুমুদিনী নিজেকে দুঃখের থেকে উঁচু করে তোলার চেষ্টা করেছে। নিজেকে স্বামীর কাছে আরও বড় করে তুলতে, অন্ধ ঘরকন্নার যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিতে কুমুদিনী স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহের প্রস্তাব তোলে। স্বামী এই অন্যায় প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে পুনর্বিবাহ 'ব্রহ্মহত্যা-পিতৃহত্যার' তুল্য বলে বিবেচিত করে। স্বামীর আদরে গভীর অনুরাগে সংসারের সাধারণ নারী থেকে কুমুদিনী 'দেবীত্বে' অভিষিক্ত হয়। অন্ধ হয়ে গভীর ও সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টিতে কুমুদিনী সংসারের ঘটনাবলী প্রত্যক্ষ করে। এদিকে ডাক্তারী ক্ষেত্রে অর্থ প্রসার ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধির ফলে কুমুদিনীর স্বামীর মধ্যে পরিবর্তন ঘটতে থাকে। অন্যায়, অধর্ম সম্পর্কে স্বামীর উদাসীন দৃষ্টি কুমুদিনীর মনকে ব্যথিত করে। দৃষ্টিহীনা নারী বুঝতে পারে প্রথম বয়সে তারা যে প্রেমের পথে যাত্রা করেছিল সে পথ এখন পৃথক হয়ে গেছে। অন্ধ কুমুদিনীর প্রতি স্বামীর প্রেম কমতে তাকে। হেমাঙ্গিনীর প্রতি স্বামীর নূতন প্রেমাবেগের সঞ্চার, ও স্ত্রীর কাছে প্রাণপণে এই ঘটনা গোপন করবার প্রয়াসের কথা কুমুদিনী অত্যন্ত সার্থকভাবে বিশ্লেষণ করে -- "অথচ পত্রদ্বারা তিনি যে তাহার (হেমাঙ্গিনীর) খবর পাইতেছেন, তাহা আমি অনায়াসে অনুভব করিতে পারিতাম; যেমন পুকুরের মধ্যে যেদিন বন্যার জল একটু প্রবেশ করে সে দিনই পদ্মের ডাঁটায় টান পড়ে -- তেমনই তাঁহার ভিতরেও একটু যেদিন স্ফীতির সঞ্চার হয়, সেদিন আমার হৃদয়ের মূলের মধ্য হইতে আমি আপনি অনুভব করতে পারি।"

দৃষ্টিহীন নারীর এরূপ সুক্ষ্ম অনুভূতি বিশ্লেষণ সাহিত্যে অত্যন্ত বিরল। এরপর স্বামী পূর্বের শপথ ভুলে দ্বিতীয় বিবাহের জন্য প্রস্তুত হয়। স্বামীর এই প্রেমহীন অপমানে কুমুদিনীর নারীত্বের অভিমান তীব্র হয়। স্বামী তাকে জানায় যে সে দেবী স্ত্রীকে ভয় করে, অন্ধতার আবরণে আবৃত স্ত্রীকে তাই অবিনাশ আগের মত ভালোবাসতে পারে না। স্বামীর এই প্রতিকূল আচরণের বিরুদ্ধে কুমুদিনী নিজেকে দৃঢ়ভাবে মানবীরূপে প্রকাশ করতে চায়। শেষপর্যন্ত সতীত্বের অহংকারে কুমুদিনী ঘোষণা করে -- "যদি সতী হই, তবে ভগবান সাক্ষী রহিলেন, তুমি কোনমতেই তোমার ধর্ম শপথ লঙ্ঘন করিতে পারিবে না। সে মহাপাপের পূর্বে হয় আমি বিধবা হইব, নয় হেমাঙ্গিনী বাঁচিয়া থাকিবে না।" এভাবে স্বামীর দ্বিতীয় বিবাহ বিরোধী মনোভাবের মাধ্যমে কুমুদিনী দেবীর আসন থেকে বাস্তবের রক্তমাংসের নারীতে পরিণত হয়। পতিপ্রেম ও সতীত্বের সংস্কারেই কুমুদিনীর কাছে তার স্বামী পুনরায় ফিরে আসে, আর দেবীরূপে নয়, নিছক সাধারণ 'ঘরের গৃহিনী' রূপে কুমুদিনী শেষপর্যন্ত নিজেকে ধরা দেয়। পাতিব্রত্যের সংস্কার, নিষ্ঠা ও আদর্শই শেষপর্যন্ত জয়ী হয়।

একান্তভাবে ঘরসংসার অভিমুখী নারীর দোলাচল হৃদয়বৃত্তির প্রকাশ ঘটেছে 'সদর ও অন্দর' (১৩০৭) গল্পে। এ গল্পে রাণী বসন্তকুমারী বি. এ পাশ করা, শৃঙ্খলাপরায়ণ রাজার স্ত্রী। রাজাকে সর্বদা নিয়মমাফিক জীবনে চালনা করাই যেন তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল। এদিকে রাজসভায় সংগীত বিলাসী, শৌখীন, অভিনয় ক্ষমতার অধিকারী সুন্দর সুকুমার মূর্ত্তি তরুণ যুবক বিপিনকিশোরের আবির্ভাবে ও সঙ্গসুখে রাজা তার সংযমের জীবনকে ভুলতে বসেছিল। রাণী তাই বিপিনকিশোরের প্রতি অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে বলেছিল -- "কোথাকার এক লক্ষ্মীছাড়া বানর আনিয়া শরীর মাটি করিবার উপক্রম করিয়াছ, ওটাকে দূর করিতে পারিলেই আমার হাড়ে বাতাস লাগে।" আবার এই রাণী-ই বিপিনকিশোরের অভিনয় দেখে ও তার গান শুনে তার অনুরাগী হয়ে পড়ে। রাণীর মনে বিপিনকিশোর অনুরাগ জাগিয়ে তোলে। এখন থেকে রাণী বিপিনকিশোরের গানের

খাতা এনে গান শিখতে চায়। বিপিনকিশোরের সুখ সুবিধার ব্যাপারে চিন্তিতা হয়ে পড়ে। রাজা রাণীর এই পরিবর্তন মানতে পারে না। তাই সদরমহল ও অন্দরমহলের পার্থক্য বজায় রাখতে হঠাৎ বিপিনকিশোরকে তাড়িয়ে দেয়। অর্থাৎ অন্দরমহলেই নারীর জীবন পুনরায় সীমিত হয়ে পড়ে। সাধারণ পরিবারের পাশাপাশি রাজপরিবারেও পুরুষেরা নারীর মানসিক প্রসার, মুক্তি ও আনন্দের দিক্‌টি মেনে নিতে অপারগ ছিল। এই প্রচলিত ধারণাই এ গল্পে প্রকাশিত।

সন্দেহবাতিক, হীনমন্য, সংকীর্ণ চিত্ত পুরুষ স্বামীর সংস্পর্শে সৎ স্বল্পভাষিণী দৃঢ়চিত্তের অধিকারিণী সুন্দরী যুবতী স্ত্রী কীভাবে আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয় -- এই কাহিনী 'উদ্ধার' (১৩০৭) গল্পে দেখানো হয়েছে।

প্রাচীন ধনী বংশের পরমাদরে পালিতা সুন্দরী কন্যা গৌরীর সঙ্গে অপেক্ষাকৃত দরিদ্র অবস্থার পাত্র পরেশের বিবাহ হয়। পরেশের দরিদ্র অবস্থার কারণে বিবাহের পরেও বেশ কিছুকাল গৌরী পিতা-মাতার কাছে কাটায়। গৌরীর সৌন্দর্য, দীর্ঘকাল বাপের বাড়ী কাটানো -- এসব তুচ্ছ কারণে হীন বুদ্ধি সম্পন্ন পরেশ বিবাহের পর থেকেই গৌরীকে সন্দেহের চোখে দেখতে থাকে। পরেশ পশ্চিমের একটা ক্ষুদ্র শহরে ওকালতি করত। বাড়িতে আত্মীয়স্বজন বড় কেউ না থাকায় একাকিনী স্ত্রীর জন্য পরেশের চিত্তে সন্দেহ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেতে থাকে। স্ত্রীকে চরিত্রহীনা কিনা এই পরীক্ষার জন্য হঠাৎ করে অসময়ে পরেশ বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়। অকারণে অবিশ্বাস করে বাড়ির চাকরকে পরেশ তাড়িয়ে দিত। এমনকি আত্মসম্বরণ করতে না পেরে পরেশ যখন বাড়ির দাসীকেই সামনাসামনি গৌরীর জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করতে শুরু করে, তখন থেকে গৌরীর দাম্পত্য সম্পর্ক নষ্ট হতে থাকে। লেখকের ভাষায় "অভিমানিনী স্বল্পভাষিনী নারী

অপমানে আহত সিংহিনীর ন্যায় অন্তরে অন্তরে উদ্দীপ্ত হইতে লাগিল এবং সেই উন্মত্ত সন্দেহ দম্পতির মাঝখানে প্রলয়খণ্ডের মতো পড়িয়া উভয়কে একেবারে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল।'' বিবাহ যেখানে দুটি নরনারীর পরস্পর বিশ্বাস ও ভালোবাসার বন্ধন, সেখানে সন্দেহের আগুন এই দম্পতির জীবনকে দগ্ধ করে তুলল। এরপর নির্লজ্জের মতো স্পষ্টভাবে প্রতিদিনই পদে পদে পরেশ গৌরীকে সন্দেহে, অপমানে উত্যক্ত করতে থাকে। গৌরী যতই নিরুত্তর, অবজ্ঞা এবং কষাঘাতের ন্যায় তীক্ষ্ণ কটাক্ষ দ্বারা তাকে আপাদমস্তক ক্ষতবিক্ষত করতে লাগল, ততই তার সংশয়মত্ততা আরো যেন বেড়ে চলল। স্বামী সংসর্গ সুখ থেকে বঞ্চিতা হয়ে সন্তানহীনা গৌরী ক্রমশঃ ধর্মকর্মে মনোযোগী হল। কারণ সেকালের বিবাহিতা নারীর সম্মুখে সংসার ছাড়া জীবনযাপনের আর একটি পথ খোলা ছিল, তা হল ঈশ্বরের আশ্রয় লাভ। সাংসারিক অসন্তোষ, অতৃপ্তি থেকে মুক্তি পেতে গৌরী নিকটস্থ পরমানন্দ স্বামীর দ্বারস্থ হয়। বলা বাহুল্য পরেশের সন্দেহ তাতেও বেড়ে ওঠে। পরেশ শালগ্রাম শিলা স্পর্শ করিয়ে গৌরীর কাছে জানতে চায় যে সে পরমানন্দকে মনে মনে ভালোবাসে কিনা। স্বামীর এই পাগলামিতে গৌরীর আত্মমর্যাদাবোধ ও চারিত্রিক দৃঢ়তা আরো বেড়ে যায়। স্বামীকে সে স্পর্ধার সঙ্গে জানায় -- ''ভালোবাসি, তুমি কী করতে চাও করো।'' গুরুদেবের কানেও এসব কুৎসার রটনা পৌঁছায়। তিনি পত্র মারফৎ গৌরীকে কৃষ্ণপ্রেমের নামে ঘর ছাড়তে বলেন। ঘটনাক্রমে সেই পত্র পরেশের হাতে পড়ে। অবিশ্বাসের আগুনে দগ্ধ স্বামী আত্মহত্যা করে বসে। ঘটনার তীব্র প্রতিক্রিয়ায় গৌরী স্তম্ভিত, শোকার্ত হয়ে পড়ে। স্থিতধী সংযমী গৌরী স্বামীর উদ্ভট অকারণ সন্দেহে সংসারসুখ ছাড়া হলেও স্বামীকে সাময়িকভাবে সে শাস্তি দিতে চেয়েছিল। কিন্তু পরেশের এই অকালমৃত্যুর ঘটনায় সে শোকে অস্থির হয়ে পড়ে। এমন সময়ে সদ্য বিধবা গৌরী পরমানন্দ স্বামীর চরিত্রহীনতার চরম কুৎসিৎ দিক্‌টি আবিষ্কার করে। যে পরমানন্দ স্বামী গৌরীর স্বামী কার্যোপলক্ষে বাইরে গেছে ভেবে পুকুরের পাড়ে লুকিয়ে চোরের মতো গৌরীর জন্য অপেক্ষা করে থাকে। পরমানন্দের কলুষিত স্বার্থতাড়িত ভণ্ড সাধুরূপ গৌরীর কাছে ধরা পড়বার পর সে স্বয়ং আত্মহত্যা করে নিজেকে উদ্ধার করে।

'প্রতিবেশিনী' গল্পে বালবিধবা এক রমণীর পুনর্বিবাহের কথা প্রকাশিত। এক্ষেত্রে এই বালবিধবা রমণীটির নিজস্ব কোন মতামত গল্পে নেই।

নারীমনের আয়নায় প্রতিফলিত সমাজ-বহির্ভূত প্রেম-জটিলতা ও আধুনিক জীবন-জিজ্ঞাসাকে যুক্তিসম্মতভাবে 'নষ্টনীড়' (১৩০৮) গল্পে প্রথমে তুলে ধরা হয়েছে। বিংশ পরিচ্ছদে লেখা এ গল্পে নর-নারীর মানসিক ঘাত-প্রতিঘাতের সূক্ষ্ম-বিশ্লেষণ চিত্র ফুটে উঠেছে। উচ্চবিত্ত বাঙালী পরিবারের বালিকাবধূ চারুলতা। স্বামী ভূপতি উচ্চশিক্ষিত, সংস্কৃতিমনস্ক, উদার ব্যক্তি। ইংরেজী সংবাদপত্র সম্পাদনায়, রাজনীতিচর্চায়, সভা-সমিতি ও বাইরের জগতের বিচিত্র কাজে ব্যস্ত স্বামী স্ত্রীর প্রতি ছিল অত্যন্ত উদাসীন। ফলে চারুলতার দাম্পত্য জীবনে কোন অভাব না থাকলেও সেখানে স্বামীর প্রেম নির্ভরতার কোন স্থান ছিল না। বিশেষতঃ চারুলতার যৌবন-সৌন্দর্য রসে উচ্ছ্বসিত দিনগুলো ধনীগৃহের নিরবচ্ছিন্ন অবকাশে মানসিক শূন্যতার হাহাকারে ম্লান হয়ে পড়েছিল। ভূপতির মনে সংস্কার ছিল -- "স্ত্রীর উপর অধিকার কাহাকেও অর্জন করতে হয় না, স্ত্রী ধ্রুবতারার মতো নিজের আলো নিজেই জ্বালাইয়া রাখে -- হাওয়ায় নেবে না, তেলের অপেক্ষা রাখে না।" ফলে স্বামীর অমনোযোগ ও অনবধান জনিত প্রেমহীনতায় ধীরে ধীরে চারুলতা বালিকাবধূ হইতে যুবতী স্ত্রী-তে পরিণত হয়। অথচ দাম্পত্য জীবনে তারা পরস্পরের কাছে "নূতনত্বের স্বাদ না পাইয়া উভয়ে উভয়ের কাছে পুরাতন - পরিচিত - অভ্যস্ত হইয়া গেল।" দাম্পত্য জীবনের এই ফাঁকিকে চারুলতা অনায়াসেই লেখাপড়ার আনন্দে কাটিয়ে উঠতে চেয়েছিল। এই সুবাদেই তার সঙ্গে পিসতুতো দেবর কলেজের ছাত্র অমলের ঘনিষ্ট, মধুর বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ছোট-ছোট ঘটনার মধ্য দিয়েই চারু ও অমলের ভালোবাসা জন্ম নিয়েছে। অমলের জুতো সেলাই করে, সাহিত্য-চর্চার প্রেরণা দিয়ে, পড়াশুনার ক্ষেত্রে অমলের সাহায্য নিয়ে

চারুলতার অফুরন্ত সময় কেটে যায়। প্রথম প্রথম চারু ও অমলের এই সখীত্বে, ভাব ও আড়ি, মান ও অভিমানের খেলায় ভূপতি অত্যন্ত কৌতুক ও আনন্দ বোধ করত। অমল ক্রমশঃ চারুলতার অনুপ্রেরণাতে সাহিত্য সৃষ্টিতে নিয়োজিত হয়। অমলের সাহিত্য প্রতিভা চারুর গণ্ডী ছাড়িয়ে বাইরে বিস্তার লাভ করে। অমলের এই বিকাশ চারুর মনে বেদনা মিশ্রিত ঈর্ষা জাগিয়ে তোলে। অমলের সঙ্গে চারুলতার সূক্ষ্ম দূরত্ব ঘনিয়ে ওঠে। অমলের লেখনীশক্তিতে অনুপ্রাণিত হয়ে চারুলতা নিজেও কিছু রচনা করতে চায়। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে চারু 'কালীতলা' নামের একটি লেখা প্রকাশ করে। চারুলতার এই লেখা অমলের দ্বারা 'সরোরুহ' নামক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সহজ, সরল আন্তরিকতার গুণে চারুলতার রচনা অমলের লেখার থেকেও বেশী প্রশংসা পায়। সমালোচক মহলে, স্বামীর কাছেও চারুলতার এই গোপন প্রতিভার দিকটি অপ্রকাশিত থাকে না। অমলও বৌঠানের গৌরবে ঈর্ষা বোধ করে। আসলে অমলের সঙ্গলাভে চারুর মনে অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে যে নিঃশব্দ প্রেমের আবির্ভাব ঘটে তার কারণ চারুলতা নিজেই বুঝতে পারেনি। অষ্টম পরিচ্ছেদে চারুলতার মনের এই ভাবটি লেখক তুলে ধরলেন — "অকারণে সে যে কেন এত অধিক কষ্ট পাইতেছে, ইহাই সম্পূর্ণ বুঝিতে না পারিয়া তাহার কষ্টের বেদনা আরো বাড়িয়া উঠিয়াছে।" এমন সময়ে ভূপতির সাংবাদিক জীবনে বিপদ ঘনিয়ে আসে। কর্মভারক্লান্ত ভূপতি স্ত্রীর কাছে আসে শান্তির খোঁজে। তখন চারুলতা "নিজের দুঃখে সন্ধ্যাদীপ নিবাইয়া জানালার কাছে অন্ধকারে বসিয়াছিল।" চারুলতা নিজের দুঃখে নিজেই দিশেহারা। আবার স্ত্রীর হৃদয়ভাব উপলব্ধিতে অক্ষম ভূপতি স্ত্রীর কাছে কোন সাড়া পেল না। দিগ্‌ভ্রান্ত হৃদয়ের এই দম্পতিদের কেউ কারো কাছে কোন নির্ভরতা পেল না। অমল দাদার এই অসহায়তার দিকটি বুঝতে পারে। তাই সে বিবাহ করে বিলাত পাশের পর দাদার দুঃখ দূর করতে চায়। খুব দ্রুত বিবাহ করে অমল চলে যায়। অমলের অনুপস্থিতিতে অসীম শূন্যতায় হাহাকার যন্ত্রণা ও বিরহের বেদনায় চারুলতার অসহ্য কষ্ট ও হৃদয় চাঞ্চল্য ঘটে। অমলের স্মৃতিতে পরিব্যাপ্ত চারুলতার অন্তর-বাহির কোথাও পালাবার পথ পায় না। অবশেষে চারুলতা হাল ছেড়ে দিয়ে আর দ্বিধা না করে সচেতনভাবেই হৃদয়ের দাবীকে

স্বেচ্ছায় মেনে নিল। ভূপতি এই ভাঙা সংসারে শেষ পর্যন্ত থাকতে পারেনি। তাই কাজের সূত্রে সে বাইরে চলে যেতে চেয়েছে। চারুও তার সঙ্গে প্রথমে যেতে চাইলেও পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়েছে। এভাবে বারোবছরের অবহেলায় নীড় নষ্ট হবার করুণ কাহিনী এগল্পে বর্ণিত হয়েছে।

প্রকৃত অর্থে সাহিত্যিক ক্ষমতা ও সহজাত প্রতিভার অধিকারিণী হয়েও সমাজ পরিবারের স্বার্থে নারীর হার মানবার সরস ব্যঙ্গগর্ভ কাহিনী 'দর্পহরণ' (১৩০৯) গল্পটি। উত্তমপুরুষে নায়কের মুখেই এ গল্পে নারীর শ্রেষ্ঠত্বের কথা স্বীকৃত হয়েছে। কলেজে পড়াকালীন আঠারো বছর বয়সের যুবক শ্রীহরিশচন্দ্র হালদারের সঙ্গে বারো বছরের বালিকা নির্ঝরিণী দেবীর বিবাহ হয়। এক শিক্ষিত সচেতন পিতার কন্যা ছিল নির্ঝরিণী। তাই পিতার কাছেই সে 'মেঘনাদবধ কাব্য', 'উপক্রমণিকা' প্রভৃতি বহুল গ্রন্থপাঠের দ্বারা পরিণত সাহিত্যমনের অধিকারী হয়ে ওঠে। বিবাহের পর ছেলের পড়াশুনার যাতে বিঘ্ন না ঘটে সেই জন্য হরিশচন্দ্রকে পিতা হোস্টেলে পাঠিয়ে দেয়। ফলে নববিবাহিতা দম্পতির বিরহ মিশ্রিত ভাব ভালোবাসা এখন পত্রেই প্রকাশিত হতে থাকে। নব্য শিক্ষায় শিক্ষিত হরিশচন্দ্র আধুনিক কবিদের কাব্য থেকে প্রভূত কোটেশান নিয়ে অনেক সাধ্য সাধনা করে স্ত্রীকে যেসব পত্র লিখত, তাতে বহু ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকে যেত। অথচ অন্তরের সরল সৌন্দর্যে, আবেগে, আন্তরিকতায় নির্ঝরিণী স্বামীকে যে পত্র পাঠাত তা যথার্থরূপে সাহিত্যগুণে সমৃদ্ধ হয়ে উঠত। পত্রে স্ত্রীর এই সাহিত্য প্রতিভার পরিচয় পেয়ে হরিশচন্দ্রের মনে গর্ব ও আনন্দের সঞ্চার হয়। সে গর্বের সঙ্গে তার বন্ধুদের এই চিঠি দেখায়।তারা এমন স্ত্রীকে সঙ্গীরূপে পাওয়ার জন্য হরিশচন্দ্রকে সৌভাগ্যবান পুরুষ বলে মনে করে। শুধু পত্র নয়, নিকট আত্মীয়া কন্যার বিবাহ উপলক্ষে নির্ঝরিণী স্নেহ-আবেগে প্রসাদগুণে উজ্জ্বল সার্থক কবিতা উপহার স্বরূপ লিখে পাঠায়। এই কাব্য সৃষ্টি প্রতিভার কথা হরিশচন্দ্রের পিতার কাছেও ক্রমশঃ প্রকাশ পায়। বক্তার কথায় তা স্পষ্ট হয়ে

ওঠে -- ''বাবা তাঁহার বধূমাতার কবিতায় রচনা নৈপুণ্য সদ্ভাব-সৌন্দর্য প্রসাদগুণ প্রাঞ্জলতা ইত্যাদি শাস্ত্রসম্মত নানাগুণের সমাবেশ দেখিয়া অভিভূত হইয়া গেলেন। তাঁহার বৃদ্ধ বন্ধুদিগকে দেখাইলেন, তাঁহারাও তামাক টানিতে টানিতে বলিলেন, 'খাসা হইয়াছে!' -- নববধূর যে রচনাশক্তি আছে, এ কথা কাহারও অগোচর রহিল না।''

বলাবাহুল্য স্ত্রীর এই পঞ্চমুখ প্রশংসায় নায়ক হরিশচন্দ্রের পৌরুষ আহত হতে থাকে। নিজেকেও সে স্ত্রীর কাছে সাহিত্য প্রতিভা বিচারে প্রতিযোগিতায় নামাতে চায়। হরিশচন্দ্র নিজে তার সাহিত্য ক্ষমতা সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন না হলেও নির্ঝরিণী দেবী তার স্বামীর বাঙলা ভাষায় অক্ষমতার বিষয়ে সচেতন ছিল। তাই পাড়ার ছেলেরা তার স্বামীকে সাহিত্য সভার সভাপতি বিবেচনা করলে স্বামীর ভাবী অপমান ও অসম্মান কল্পনা করে সে স্থির থাকতে পারেনি ; কারণ সেখানে স্বামীর বক্তৃতাতেই মাতৃভাষার অজ্ঞতার দিকটি প্রকাশ পেয়ে যেত। মাথাব্যথার মিথ্যা অজুহাত দিয়ে স্বামীকে সে যাত্রায় নিবৃত্ত করে। স্বামীর প্রতি স্ত্রীর এই অবিশ্বাসের সংস্কার হরিশচন্দ্রের মনে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব জাগিয়ে তোলে। ফলে সে স্ত্রীর সঙ্গে কাব্যসাহিত্য বিষয়ে তর্ক জুড়ে দেয়। অহংকারের সঙ্গে ঘোষণা করে -- ''লিখিবার যোগ্য কোন লেখা কোনদেশে কোনদিন কোন স্ত্রীলোক লেখে নাই।'' মেয়েদের প্রতি স্বামীর এই হীনধারণার বিরোধিতা করে নির্ঝরিণী বলে, ''কেন মেয়েরা লিখিতে পারিবে না, মেয়েরা এতই কি হীন?'' নির্ঝরিণীর এই বক্তব্য শুধু মুখের কথাতেই থেমে থাকেনি, পঞ্চাশ টাকা পুরস্কারে 'উদ্দীপনা' মাসিক পত্রিকায় সাহিত্য প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্ব বিচারের আশায় স্বামী-স্ত্রী উভয়েই গল্প লিখে পাঠায়। নায়কের 'বিক্রমনারায়ণ' গল্পের দর্পহরণ করে বৈশাখ সংখ্যার 'উদ্দীপনা' পত্রিকায় পুরস্কার যোগ্য গল্পের মহিমায় স্থান পায় নির্ঝরিণী দেবীর 'ননদিনী' গল্পটি। গল্প লেখার প্রতিযোগিতাতে জয়ী হয়েও নির্ঝরিণীর এক বিপরীত প্রতিক্রিয়ার রূপ লেখক এতে অঙ্কণ করলেন, যা আমাদের সমাজে অত্যন্ত বাস্তবোচিত। তাই স্বামীকে হারিয়ে আনন্দ

নয় , এক অপরাধবোধে আচ্ছন্ন হয়ে প্রবল কান্নায় ভেঙে পড়ে তার সমগ্র নারী হৃদয় । এরপর আর কোনদিন সে সাহিত্য সৃষ্টির কথা মুখেও আনেনি ।

এগারোটি পরিচ্ছেদে লেখা 'মাস্টারমশায়' (১৩১৪) গল্পে মফঃস্বলবাসী নিম্নবিত্তশ্রেণীর ভদ্রঘরের ছেলে হরলালের মাতার অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । এতে দেখি "বিধবা মা পরের বাড়িতে রাঁধিয়া ও ধান ভানিয়া তাহাকে মফঃস্বলের এনট্রেন্স স্কুলে কোনোমতে এনট্রেন্স পাশ করাইয়াছে ।" হরলালের সমগ্র জীবনকেই এই স্নেহময়ী জননী স্থির ধ্রুবতারার মতো পথ দেখিয়েছে । আবার যে মায়ের চরম স্নেহের আশ্রয়ে হরলাল ধন্য হয়েছিল , মৃত্যুকালেও সেই মহান মূর্ত্তি-ই বিশ্বব্যাপ্ত হয়ে তার মগ্ন-চৈতন্যে প্রতিভাত হয়েছে -- "তখন হরলাল আপনার বন্ধনমুক্ত হৃদয়ের চারিদিকে অনন্ত আকাশের মধ্যে অনুভব করিতে লাগিল , যেন তাহার সেই দরিদ্র মা দেখিতে দেখিতে বাড়িতে বাড়িতে বিরাটরূপে সমস্ত অন্ধকার জুড়িয়া বসিতেছেন , তাহাকে কোথাও ধরিতেছে না । কলিকাতার রাস্তা-ঘাট বাড়ি-ঘর দোকান-বাজার একটু একটু করিয়া তাঁহার মধ্যে আচ্ছন্ন হইয়া যাইতেছে -- বাতাস ভরিয়া গেল , আকাশ ভরিয়া উঠিল একটি একটি করিয়া নক্ষত্র তাহার মধ্যে মিলাইয়া গেল , -- হরলালের শরীর মনের সমস্ত বেদনা সমস্ত ভাবনা , সমস্ত চেতনা , তাহার মধ্যে অল্প অল্প করিয়া নিঃশেষ হইয়া গেল , -- ঐ গেল , তপ্ত বাষ্পের বুদ্ বুদ্ একেবারে ফাটিয়া গেল -- এখন আর অন্ধকারও নাই , আলোকও নাই , রহিল কেবল একটি প্রগাঢ় পরিপূর্ণতা ।" এভাবে জীবনযুদ্ধে হেরে যাওয়া হরলালের কাছে তার সত্তা শেষ পর্যন্ত বিশ্বমায়ের সৌন্দর্যে প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে ।

'রাসমণির ছেলে' (১৩১৮) গল্পে নারী তথা প্রধান নারী চরিত্র রাসমণি । এক দরিদ্র বৈষ্ণব বংশে তার জন্ম । তার সঙ্গে বনিয়াদী ধনী বংশের সন্তান , নিতান্ত নিরীহ সহজ প্রকৃতির পুরুষ

ভবানীচরণের বিবাহ হয়। ভবানীচরণ ধনী বংশের সন্তান হলেও আত্মীয়স্বজনের চক্রান্তে তাকে অর্থনৈতিক দুরবস্থায় পড়তে হয়। উপরন্তু ছোটবেলা থেকেই লেখাপড়া না শিখে, অপরের অবহেলায় নিজ চরিত্রকে সে সুগঠিত করতে পারেনি। অপহৃত সম্পত্তি তথা হারানো উইল ভবিষ্যতে পাওয়া যাবে জেনে সে ভাগ্যের আশায় নিশ্চিন্ত হয়েছিল। স্বামীর সাংসারিক বোধ বুদ্ধির অভাবের কারণে রাসমণিকেই দিনরাত দৈন্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে সংসার চালাতে হত। এ কারণে তার ব্যক্তিত্বে নারীর নমনীয়তার চেয়ে কঠিন প্রকৃতি সঞ্চারিত হতে থাকে। ভবানীচরণ ছিল "একান্তভাবে রাসমণির সেবায় পালিত জীব।" তাদের একমাত্র পুত্রসন্তান কালীপদ। রাসমণি বলতেন, 'আমি গরীবের মেয়ে, মান-সম্ভ্রমের ধার ধারি না; কালীপদ আমার বাঁচিয়া থাক্, সেই আমার সকলের চেয়ে বড় ঐশ্বর্য।' আসলে দরিদ্র বংশের কন্যা হওয়ায় তার মধ্যে সংগ্রামী মনোভাবের দিকটি বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছে। জ্যোতিষীর ভবিষ্যৎ বাণী ও উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সম্পত্তিতে তার কোন আস্থা ছিল না। তাই রাসমণি প্রকৃত শিক্ষায়, আদর্শে, সংযমে, আদেশে ও পরিশ্রমের দ্বারা কালীপদকে যথার্থ মানুষ করে তুলতে চেয়েছে। কালীপদর জীবনে তার মার প্রভাব ছিল অপরিসীম। একদিকে স্বামীর প্রতি কর্তব্য, অপরদিকে পুত্র বাৎসল্য, এই দুই ভাবাদর্শে, ত্যাগে, প্রেমে তার নারীত্ব সার্থকতা খুঁজেছে। ভাগ্যের নিষ্ঠুর চক্রান্তে তার একমাত্র বক্ষের ধন প্রাণের চেয়েও প্রিয়, পুত্রের মর্মান্তিক মৃত্যুযন্ত্রণা বুকে চেপে তাকে জীবনের বাকী দিনগুলো কাটাতে হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের প্রথমপর্যায়ে মোট একাত্তরটি গল্পের মধ্যে যে সমস্ত গল্পে নারীর সুখ-দুঃখময় নানা যন্ত্রণা, বঞ্চনা ও ব্যথা-বেদনার জীবন ও সমাজ-সংস্কারের পরিচয় পাওয়া গিয়েছে, তা এই অধ্যায়ে তুলে ধরা হ'ল। এ পর্যায়ের সমস্ত গল্পেই নারীর পরিচয় ও প্রাধান্য পাই না। কখনো গল্পের কাহিনীর প্রয়োজনে নারী গৌণ ভূমিকা নিয়েছে; আবার কখনো নারীর সমাজ-সংস্কারবদ্ধ জীবনের খণ্ড খণ্ড চিত্র এ সব গল্পে ফুটে উঠেছে। মূলতঃ গার্হস্থ্য জীবন, সামাজিক

বন্ধন ও সনাতনী রূপ নিয়েই এ পর্যায়ে নারীর জীবন আবর্তিত হয়েছে। তবে কোন কোন গল্পে পরিবার ও সমাজের প্রচলিত সংস্কারকে উপেক্ষা করে নারী তার অসহায় অপমান ও যন্ত্রণার উপশম ঘটিয়েছে। সমাজের প্রতিকূল বিরুদ্ধ পরিবেশ থেকেই কোথাও কোথাও নারীর সুপ্ত ব্যক্তিত্ব জেগে উঠেছে। তবে এর জন্য নারীকে চরম মূল্য, এমনকি মৃত্যু দিয়ে নারীত্বের যথার্থ সম্মান আহরণ করতে হয়েছে। এভাবে চিরাচরিত স্বভাবধর্মের পাশাপাশি নারীর ব্যতিক্রমী জীবন পরিচয় ও পরিবর্তনের সূক্ষ্ম ইঙ্গিত এ পর্যায়ের কোন কোন গল্পে রচিত হয়েছে।